এরাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ

জুল ভার্ন অমনিবাস

সূচিপত্র

১. বাজি 3
২. মিস্টার ফিক্স, ডিটেকটিভ 20
৩. মিস্টার ফিক্সের অনুসন্ধান 30
৪. ঘূর্ণিপাকে 41
৫. দুঃসাহসের ডাকে 58
৬. বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে অতর্কিতে 68
৭. ডিটেকটিভ ফিক্সের তৎপরতা 79
৮. ইচ্ছে থাকলে উপায়ও থাকে 97
৯. ইয়োকোহামার জাপানি সার্কাস 109
১০. ইয়াংকিদের হালচাল 121
১১. কখনও হতাশ হতে নেই 146
১২. ভাগ্য যখন বিরূপ 157
১৩. আউদার কথা 161

১৪. সব ভালো তার শেষ ভালো যার 165

১. বাজি

বাগ্মী হিশেবে পৃথিবী-জোড়া নাম হয়েছিলো শেরিডানের। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে যে-বাড়িতে তার জীবনান্ত ঘটেছিলো, আঠারো শতকের শেষের দিকে সেই বাড়িতেই থাকতেন রিফর্ম ক্লাবের সভ্য ফিলিয়াস ফগ। কিন্তু পরিহাস এটাই যে শেরিডান কথা বলতে যত ভালোবাসাতেন ফিলিয়াস ফগ কিন্তু ঠিক ততটাই ভালোবাসতেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকতে–পারতপক্ষে কোনো কথা না-বলতে পারলেই বুঝি তিনি সবচেয়ে খুশি থাকতেন।

ফগের টাকাকড়ি ছিলো অঢেল, কিন্তু কীভাবে তিনি টাকা রোজগার করতেন, সেএক মহা-রহস্য। রিফর্ম ক্লাবের মেম্বার হিশেবেই তাকে সকলে জানতো, কাজ-কারবার কোনোকিছু করতে কেউ তাকে দ্যাখেনি—অথচ টাকা ছিলো অঢেল। ফগ কথা বলতেন কম, খরচ করতেন কম, আর তার সংযম ছিলো সে-এলাকার সকলের আদর্শ। অথচ, কিপ্টেও ওঁকে বলা চলে না, কেননা তার দানের পরিমাণ ছিলো প্রচুর। বিলাসিতা জিনিশটা অসহ্য ছিলো ফগের কাছে। কিন্তু, তাঁর সম্পর্কে যে-কথাটি সবচাইতে আগে বলবার, তা হলো : তার সাংসারিক কাজকর্ম চলতো ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায়—একসেকেণ্ড এদিকওদিক হলেই কুরুক্ষেত্র বেধে যেতো।

ভূগোল ছিলো ফগের নখদর্পণে। আর সেজন্যেই অনেকেই মনে করতে তিনি বুঝি অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেছেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার-লণ্ডনের একচুল বাইরে কখনও তিনি পদার্পণও করেননি। নিজের বাড়ি, আর রিফর্ম ক্লাব-এই দু-জায়গা ছাড়া ফগ আর-কোথাওই যাননি কখনও।

বাজি রেখে তাশ খেলা ছাড়া আর-কোনো নেশা ছিলো না ফগের। ক্লাব-ঘরে বসে খবর-কাগজ পড়া আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তাশ খেলা ছাড়া আর-কিছুই তিনি জানতেন। তাশ খেলায় তাকে কেউ হারতে দেখেছে বলে মনে হয় না। বাজির টাকা নিজে–মিয়ে ফগ দান করতেন, কাজেই এ-কথা বলাবাহুল্য যে টাকার লোভে তিনি তাশ খেলতেন না। হুইস্ট খেলায় মাথা লাগে বলেই বোধহয় হুইস্ট খেলায় ফগের এত টান ছিলো আর সে-খেলায় সম্ভবত তার কোনো জুড়ি ছিলো না।

আপন বলতে দুনিয়ায় ফগের কেউ ছিলো না; সেভিল-রোর সেই নির্জন বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন। বাড়িতে ফগের সঙ্গে দেখা করতে কেউ কখনও গেছে বলে কোনো নজির পাওয়া যায় না। রিফর্ম ক্লাবেই, প্রত্যহ, একলাই, তিনি আহার করতেন–তার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে কাউকে কখনও দেখা যায়নি। ক্লাবের ওয়েটাররা খুব-সতর্ক হয়ে তাকে খাবার পরিবেষণ করতো। সবচেয়ে ভালো জিনিশ ছাড়া কিছুই যে তিনি ঠোটে ছোঁয়ান না, সে-কথা ওয়েটারদের ভালো করেই জানা ছিলো।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দশ ঘণ্টা বাড়িতে থাকতেন ফগ, আর সেই দশ ঘণ্টা কাটতো ঘুমুতে ও পোশাক-আশাক পরতে। আড়ম্বর না-থাকলেও তার বাড়িতে স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো, আরাম ছিলো। জেমস ছিলো তার পরিচারক। প্রভুর মেজাজ বুঝে তাকেও ঠিক ঘড়ির কাটায়-কাটায় নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করতে হতো। আমাদের কাহিনীর যবনিকা যেদিন উঠলো, সেদিন জেমস ফগকে দাড়ি কাটবার জন্যে যে-গরম জল দিয়েছিলে তা ছিয়াশি ডিগ্রি না-হয়ে চুরাশি ডিগ্রি হয়েছিল বলে সঙ্গে-সঙ্গে বরখাস্ত হয়ে গেছে। সে, প্রায় বিনাবাক্যব্যয়েই।

ইজি-চেয়ারে বসে ফগ তাকিয়ে ছিলেন তার ঘড়ির দিকে। ঘড়িটা, লা-বাহুল্য, সবচেয়ে ভালো জাতের। ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড তো বটেই, বারের নাম, মাস, বছর পর্যন্ত পাওয়া যেতো ঐ ঘড়িতে। সোয়া-এগারোটা বাজে তখন। অন্যদিন ফগ এই সময়েই ক্লাবে যেতেন। কিন্তু আজ সবকিছুই যেন কেমন গোল পাকিয়ে গেছে।

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় সোয়া-এগারোটার সময় জেমস ঘরে ঢুকে জানালে, কর্তা, নতুন লোক এসেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে বছর-ত্রিশের একজন ফরাশি ঘরে ঢুকলো। ফগ লোকটার দিকে তাকালেন। ফরাশি দেখছি! তোমার নামই জন?

জন না, জাঁ—জাঁ পাসপার্তু। লোকটি বললো, বোধহয় একটু বেশিই কথা বলে সে, আমার ধারণা, লোক আমি খারাপ নই। এ-পর্যন্ত অনেকরকম কাজই করেছি আমি। কিছুদিন রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়েও বেড়িয়েছি। এক সার্কাসের দলেও ছিলাম কিছুকাল–ট্রাপিজের খেলায় তো রীতিমতো ওস্তাদ। এক কুস্তির আখড়ায়ও সর্দারি করেছি কিছুদিন। পারীর রেলে ফায়ারম্যানও ছিলাম কয়েকদিন। পাঁচ বছর হলো ফ্রান্স ছেড়েছি। ইংল্যাণ্ডে এক ভদ্রলোকের কাছে কাজ করেছিলাম কিছুকাল—কিন্তু শেষ অব্দি তার কাছে কাজ করা আর পোষালো না। এখন তাই বেকার বসে আছি। শুনলাম, আপনার একজন পরিচারক চাই। আরো শুনলাম, আপনি সংযমী আর সময়ানুবর্তী। আপনার কাছে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবো–এই ভরসাতেই এসেছি।

ফগ জবাব দিলেন, ঠিক আছে। তোমার সততার কথা আমি আগেই শুনেছি, সার্টিফিকেটগুলোও দেখেছি। এই চাকরির শর্তগুলো সব জানো তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ। এখন ক-টা বেজেছে?

পাসপার্তু তার জেব থেকে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি বের করে বললে: এগারোটা বাইশ।

উঁহু! তোমার ঘড়ি ঠিক নয়—স্লো চলছে।

অসম্ভব। পাসপার্তু প্রতিবাদ করলে, বেশ সজোরেই।

তোমার ঘড়ি চারমিনিট স্লো চলছে। সে-যাক, ভুলটা শুধরে নিলেই হলো। মনে রেখো, আঠারোশো বাহাত্তর সালের দোসরা অক্টোবর বেলা এগারোটা ছাব্বিশে তুমি আমার কাজে ভর্তি হলে। বলতে-বলতে ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ফগ, যচেলা মানুষের মতো টুপিটা মাথায় দিলেন, তারপর আর-কিছু না-বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

নতুন মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে পাসপার্তু এতক্ষণ তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিলো। তার নতুন প্রভুর চেহারাছিরি দিব্বি, সুন্দর কান্তি ফগের, লম্বা-চওড়া শরীর। দেখলেই মনে হয়, ফগ এককথার মানুষ। যারা ভালো করে লক্ষ করেছিলো, তারা জানতো, ফিলিয়াস ফগ কখনও খামকা, কারণবিনা কোনো কাজ করতেন না। যেখানে এক-পা ফেললেই চলে, সেখানে কেউ তাকে দু-পা এগুতে দ্যাখেনি। যে-পথে গেলে সবচেয়ে-কম

সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুনো যায়, ফিলিয়াস ফগ সবসময় সেই পথেই পা বাড়াতেন। বাধা তার কাছে বাধাই ছিলো না। যা ধরতেন, তা শেষ না-করে তিনি ছাড়তেন না। খামকা কোনোকিছু করা তার অভ্যেস ছিলো না। দুঃখে-আনন্দে অবিচলিত, বিপদে অচঞ্চল, সদা শান্ত, ধীরস্থির ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফগ এক আশ্চর্য-স্বভাব লোক ছিলেন। তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে কেউ তাকে কখনও দ্যাখেনি। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, সাতে-পাঁচে কোনো রা করতেন না বা কাড়তেন না।

জাঁ পাসপার্তুও মানুষ হিশেবে ভালোই। দৃঢ়গড়ন শরীর তার, এত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মুখে একটা আশ্চর্য-সরল লাবণ্যের ছাপ। অনেকদিন অনেকরকম কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো–তাই কিছুদিন শান্তিতে কাটানোর জন্যেই ফগের কাছে এসে চাকরি নিয়েছিলো সে।

পাসপার্তু তার ঘরকন্না দেখে নিতে লাগলো। দেখলো, যেখানে যা থাকা উচিত, এ-বাড়িতে তা ঠিক-সেখানেই আছে। কোথাও বিলাসিতার চিহ্নও নেই, অথচ কোনো অভাবও নেই। পাসপার্তু মনে-মনে খুশিই হলো। সবকিছু দেখে-শুনে সে নিজের ঘরে এসে হাজির হলো। ঘরটা ভালো। একদিকে একটা টেলিফোন আর একটা ইলেকট্রিক বেলও আছে সেই ঘরে। ফায়ার-প্লেসের উপরে দেয়ালে একটা ইলেকট্রিক ঘড়ি টিকটিক করে চলছে। ফগের ঘরের ঘড়ি আর এই ঘড়ি ঠিক একইসময় রাখছিলো। ঘড়িটার পাশেই, দেয়ালে, একটা কাগজে পরিচারকের প্রাত্যহিক কাজের একটা রুটিন ঝুলছিলো। পাসপার্তু পড়তে লাগলো : আটটা তেইশ মিনিটে প্রাতরাশ, ন-টা সাঁইত্রিশ মিনিটে দাড়ি কামাবার জন্য গরম জল, পৌনে দশটার সময় স্নানের আয়োজন ইত্যাদি-

ইত্যাদি। পাসপার্তু তার কাজের রুটিনে মনঃসংযোগ করলো বেশ খুশি মনেই, যাকে বলে হৃষ্ট চিত্তে।

ক্লাবে পৌঁছেই ফগ কারু সঙ্গে কোনো কথা না-বলে নিজের খাবার-টেবিলে গিয়ে বসলেন। বারোটা সাতচল্লিশ মিনিটের সময় খাওয়া শেষ করে ড্রয়িংরুমে এসে পৌঁছুবামাত্র বেয়ারা তার হাতে একটি টাইমস কাগজ দিয়ে গেলো। টাইমস আর তারপর স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজ পড়তে-পড়তেই বিশ্রামের সময় হয়ে গেলো। বিশ্রাম সেরে ফগ একটি মর্নিং ক্রনিকল হাতে ক্লাবের সেলুনে এসে ঢুকলেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই তার বন্ধু-বান্ধবে ঘরটা ভরে গেলো। এঁরা সবাই হুইস্টে একএকজন নামজাদা খেলোয়াড়। আন্দ্রে স্টুয়ার্ট, জন সলিভান, স্যামুয়েল ফলেন্তিন, টমাস ফ্লাগেন, বিলেতের বড়ো-একটা ব্যাংকের অন্যতম ডিরেক্টার গথিয়ার র্যাল্‌ফ–এঁদের কারুই টাকার অভাব ছিলো না। বেশ কিছুকাল ধরেই ফিলিয়াস ফগের হুইস্ট-যুদ্ধ চলছে এঁদের সঙ্গেই।

ফায়ার-প্লেসের চারদিকে বসে এঁরা গল্প-গুজব করতে লাগলেন। ফ্লানাগেন বললেন : র্যাল্‌ফ, এই-যে সাংঘাতিক ডাকাতিটা হয়ে গেলো, এর কিনারা কিছু হলো কি?

স্টুয়ার্ট বললেন : কী আর হবে? ব্যাংকের টাকাগুলো সবই মাঠে মারা গেলো আর-কি!

স্টুয়ার্টের কথায় কান না-দিয়েই র্যাল্‌ফ বললেন, আমার অবশ্য ভরসা হচ্ছে যে চোর ধরা পড়বেই। আমেরিকা, ইওরোপ, এশিয়া—সবখানেই আমাদের ডিটেকটিভ আছে।

প্রত্যেক বড়ো-বড়ো বন্দরেই তারা খবর নিচ্ছে। এদের চোখে ধুলো দিয়ে, এদের ফাঁকি দিয়ে পালানো খুব সহজ নয়।

স্টুয়ার্ট বললেন : তাহলে চোরের চেহারা কেমন তা আপনারা জানেন?

কথা শুনে র‍্যাল্‌ফ দৃঢ়স্বরে বললেন : চোর কেন বলছেন? টাকাটা যে নিয়েছে, সে চোর নয়।

সে-কী। স্টুয়ার্ট অবাক হলেন। সাড়ে-আট লক্ষ টাকার নোট নিয়ে যে সরে পড়তে পারে, সে যদি চোর না-হয় তো কী?

না, চোর সে নয়!

বিদ্রূপে ফেটে পড়লেন সলিভান : না, না, সে কেন চোর হতে যাবে? সে হলো সন্ত পলের অতীব আদরের চেলাটি।

এতক্ষণে খবরের কাগজ থেকে মাথা তুললেন ফগ। মর্নিং ক্রনিকলে পড়ছিলুম যিনি নোটগুলো নিয়েছেন, তিনি নাকি আপাদমস্তক একজন ভদ্রলোক।

আলোচনা চলতে লাগলো।

তিনদিন আগে ইংল্যাণ্ডের ব্যাংক থেকে সাড়ে-আট লাখ টাকার নোট চুরি হয়েছিলো। ব্যাংকের অন্যতম ডিরেক্টার র‍্যাল্‌ফ সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন : এই চুরির জন্যে ক্যাশিয়ার বেচারির কিন্তু কোনো দোষ নেই। ও কী করবে? ও তখন মন দিয়ে ব্যাংকের

একটা পাওনা খাতায় জমা করছিলো। একটা লোক তো আর চারদিকে নজর রাখতে পারে না। দুটো বৈ তো তার আর চোখ নেই।

ব্যাংক অভ ইংল্যাণ্ডে যারা টাকাকড়ি দিতে বা নিতে আসতেন কর্তৃপক্ষ তাদের সততা সম্পর্কে কখনোই কোনো সন্দেহ করেননি। কেউ নোট দেখছেন, কেউ সোনা পরীক্ষা করছেন, কেউ-বা হিরে-জহরৎ মণি-মুক্তো দেখছেন। পরীক্ষার পর সবাই আবার যথাস্থানে টাকাকড়ি মণিমুক্তো রেখে দিতেন–এইভাবেই কাজ চলতো। কিন্তু সেদিন যিনি নোট নিয়েছিলেন তিনি আর তা ফেরৎ দেননি। বেলা পাঁচটার সময় যখন ব্যাংক বন্ধ করা হবে, তখনই প্রথম জানা গেলো যে, ব্যাংকের সাড়ে-আট লাখ টাকা চুরি হয়েছে।

অমনি হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেলো। চারদিকে ডিটেকটিভ পাঠানো হলো। মুহূর্তে দেশে-বিদেশে ঐ চুরির খবর ছড়িয়ে পড়লো। ব্যাংক অভ ইংল্যাণ্ড ঘোষণা করলো, চোর ধরতে পারলে ত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার তত মিলবেই, তা ছাড়া অপহৃত টাকার যতটুকু পাওয়া যাবে, তার উপর শতকরা ত্রিশ টাকা হিশেবে কমিশন দেয়া হবে।

মর্নি ক্রনিকল জানালে যে, ঘটনার দিন আচার-ব্যবহারে-সুমার্জিত ভদ্রবেশধারী একটি লোককে ব্যাংকের নোট পরীক্ষা করতে দেখা গিয়েছিলো। তার পোশাক ও চেহারার বর্ণনা ডিটেকটিভদের দেয়া হয়েছিলো বলেই কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, চোর ধরা পড়বেই। খবরের কাগজগুলো তো হুজুগ পেলেই হৈ-চৈ করে, এবারও শোরগোল তুলতে তারা ভোলনি।

র‍্যাল্‌ফের বিশ্বাস পুরস্কারের লোভে ডিটেকটিভরা নিশ্চয়ই প্রাণপণ চেষ্টা করবে–তাহলে চোর বা দস্যু যা-ই সে হোক না কেন ধরা পড়বেই। স্টুয়ার্টের মত ছিলো অন্যরকম। হুইস্ট খেলতে-খেলতে তাই তারা এই জবর-গরম খবরেরই আলোচনা করতে লাগলেন। স্টুয়ার্ট বললেন : চোর যে মহাধুরন্ধর, তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস ও পালিয়ে যাবে।

র‍্যাল্‌ফ বললেন : পালাবে তো বটেই–কিন্তু যাবে কোথায়, বলুন।

কেন? দুনিয়ায় কি জায়গার অভাব আছে নাকি! পৃথিবীটা তো আর এতটুকু এক এঁদোগলি নয়, পালাবার জায়গার আবার ভাবনা!

ফিলিয়াস ফগ তাশ শাফল করতে-করতে বললেন : এককালে পৃথিবীটা বড়োই ছিলো বটে, তবে এখন আর সে-দিন নেই।

স্টুয়ার্ট বললেন : তার মানে? পৃথিবীটা কি এখন ছোটো হয়ে গেছে। নাকি?

র‍্যাল্‌ফ বললেন : ঠিক তা-ই। একবার পৃথিবীটা ঘুরে আসতে এখন যে-সময় লাগে, আগে লাগতো তার দশগুণ বেশি। তবেই তো পৃথিবী ছোটো হয়ে গেলো। এইজন্যে চোরের সন্ধান খুব তাড়াতাড়ি হবে—সে আর পালাবে কোন চুলোয়?

ফগ বললেন : মিস্টার স্টুয়ার্ট, এবার আপনার পালা, খেলুন।

আর খেলা! স্টুয়ার্টের তখন খেলার দিকে মন ছিলো না। এখন তিন মাসে পৃথিবী ঘুরে আসা যায় বলে পৃথিবীটা এতই ছোটো হয়ে গেছে যে আপনি দিব্বি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন?

ফগ বাধা দিলেন : তিন মাস তো ঢের-বেশি—আশিদিনেই এখন সারা দুনিয়া ঘুরে আসা যায়।

সলিভান সায় দিলেন ফগের কথায়। এ-কথা ঠিক। রোটাস থেকে এলাহাবাদ অব্দি গ্রেট-ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলপথ খুলেছে। এখন আশিদিনেই সারা পৃথিবী ঘোরা হয়ে যায়। এই দেখুন-না, মর্নিং ক্রনিকলে লিখেছে, মাসেও ব্রিন্দিসি হয়ে রেল ও স্টীমারে লণ্ডন থেকে সুয়েজ সাতদিন : স্টীমারে সুয়েজ থেকে বম্বাই তেরোদিন, রেলে বম্বাই থেকে কলকাতা তিনদিন, স্টীমারে কলকাতা থেকে হংকং তেরোদিন; স্টীমারে হংকং থেকে ইয়োকোহামা ছয়দিন; স্টীমারে ইয়োকোহামা থেকে সানফ্রান্সিসকো বাইশদিন; রেলে সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউইয়র্ক সাতদিন, রেল আর স্টীমারে নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডন নয়দিন—একুনে আশিদিন।

দিনের হিশেব কষতে-কষতে খেলার কথা ভুলে গিয়ে স্টুয়ার্ট একটা ভুল তাশ খেলে ফেললেন। হ্যাঁ, আশিদিনই বটে। কিন্তু ঝড়-তুফান, জাহাজ-ডুবি, রেল—কলিশন–এ-সব তো আর ও-হিশেবে ধরা হয়নি।

ফগ বললেন : সে-সব ধরেই বৈকি।

বলেন কী? স্টুয়ার্ট যেন অবাকই হলেন একটু। সে-সব ধরেই? যদি মার্কিন মুলুকের ষণ্ডাগুণ্ডারা পথ থেকে রেল উঠিয়ে রাখে, কিংবা যদি ট্রেন থামিয়ে লুঠতরাজ শুরু করে দেয়, তাহলে

শান্তগলায় ফগ জবাব দিলেন হ্যাঁ, তাহলেও—এই দেখুন, আমার হাতে দুটো রঙ। এ-বাজি আমার।

স্টুয়ার্ট বললেন : ও-সব গাঁজাখুরি ব্যাপার খবরকাগজেই মানায়, বাস্তবে বাস্তবেও ঐ হিশেব ঠিক।

স্টুয়ার্ট হাসলেন। আপনিই একবার করে দেখান না যে আশিদিনেও পৃথিবী ঘুরে আসা যায়।

চলুন-না, আপনিও ঘুরে আসবেন আমার সঙ্গে।

উঃ-রে ব্বাস-রে! আমি বাপু এই অসম্ভব ব্যাপারে নাক গলিয়ে নাকাল হতে চাইনে। আপনি যদি আশিদিনেই পৃথিবী ঘুরে আসতে পারেন, আমি তবে ষাট হাজার টাকা দেবো।

আশিদিনে পৃথিবী ঘুরে-আসা—এই তো? বেশ, আমিই না-হয় যাবো।

কবে?

কেন?

এক্ষুনিই রওনা হয়ে পড়বে। তবে আগেই বলে রাখছি সমস্ত খরচ কিন্তু আপনার।

ফগের একগুঁয়েমি দেখে স্টুয়ার্ট একটু বিরক্তই হয়ে পড়লেন। এইসব বাজে কথা রেখে, আসুন তো, এক-হাত খেলা যাক ভালো করে।

আগের বাজি আপনি হেরেছিলেন—এবার আপনিই শুরু করুন।

কী মনে করে স্টুয়ার্ট আবার বললেন : দেখুন মিস্টার ফগ, আপনি যদি রাজি থাকেন তো আমি ষাট হাজার টাকাই বাজি রাখবো। যখন একবার বলেছি বাজি ধরবো, তখন কোনোমতেই সে-কথা নড়চড় হবে না বা মিথ্যে হবে না।

বেশ-তো, ভালো কথা। ফগ বললেন। আমিও পিছু হঠবার পাত্র নাই। ব্যারিংএর গদিতে আমার তিন লাখ টাকা জমা রয়েছে–আমি সেই তিন লাখ টাকাই বাজি রাখছি।

সলিভান অবাক হয়ে গেলেন। তিন লাখ টাকা বাজি! এ আপনি বলছেন কী, মিস্টার ফগ? পাগল হলেন নাকি? একটা সামান্য-কিছু গোলযোগ হলেই তো আপনার সব টাকা জলে যাবে! রাস্তায়-ঘাটে কত রকম বাধা-বিপত্তি আছে। এখন হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু পরে—

ফগ বাধা দিয়ে বললেন : অদৃষ্টপূর্ব এমন-কিছু ঘটতেই পারে না।

এই-যে আশিদিনের হিশেব, এর চেয়ে কম সময়ে সারা দুনিয়া ঘুরে আসা কিন্তু অসম্ভব।

সবদিকে চোখ রেখে ঠিকমতো চলতে পারলে কম সময়েই সব কাজ করা যায়।

আপনাকে অনেকবার ট্রেন থেকে স্টীমারে, স্টীমার থেকে ট্রেনে ওঠা-নামা করতে হবে। একটু যদি দেরি হয়, যদি ট্রেন বা স্টীমারে ঠিক সময়ে উঠতে না পারেন—

কে বললে আমার দেরি হবে?

এ আপনি ঠাট্টা করছেন নিশ্চয়ই।

ঠাট্টা? সত্যিকার ইংরেজ বাজি রেখে কখনও ঠাট্টা করে না। আপনাদের যাঁর ইচ্ছে তাঁর সঙ্গেই বাজি ধরতে আমি রাজি আছি। হ্যাঁ, তিন লাখ টাকার বাজি—আমি আশিদিনের মধ্যে সারা দুনিয়া ঘুরে আসবো। আপনারা রাজি আছেন?

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সবাই জানালেন : হ্যাঁ, রাজি।

বেশ। পৌনে ন-টায় ডোভার মেল ছাড়ে–আমি ওতেই রওনা হচ্ছি।

সে-কী! স্টুয়ার্ট রীতিমতো তাজ্জবই হলেন। আজ সন্ধ্যায়ই?

হ্যাঁ, আজই সন্ধ্যায়। আজ দোসরা অক্টোবর, বুধবার। একুশে ডিসেম্বর শনিবার পৌনে ন-টার মধ্যে আমি এই ক্লাব-ঘরে এসে হাজির হবো। যদি না-পারি, তবে ব্যারিংএর গদিতে আমার যে তিন লাখ টাকা আছে, সে-সবই আপনাদের হবে। এই নিন, ঐ টাকার চেক রাখুন।

তক্ষুনি বাজির শর্তগুলো লেখা হলো। দু-তরফই সেই দলিলে সই করলেন।

ফিলিয়াস ফগ কিন্তু তখনও আগের মতোই অবিচলিত। ফগ জানতেন যে তার যথাসর্বস্ব হলো ছ-লাখ টাকা। এই অভূতপূর্ব ভ্রমণেই তার অর্ধেক খরচ হয়ে যাবে। তাই তিনি তিন লাখ টাকা বাজি ধরেছিলেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধব সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—টাকার জন্যে নয়, তারা সবাই একেকজন টাকার তিমিঙ্গিল, কিন্তু তবু এমন অবস্থায় এ-রকম বাজি ধরলে আপনা-আপনিই যেন বুক কেঁপে ওঠে।

ফগ কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে তাশ খেলছিলেন। দেখতে-দেখতে সাতটা বেজে গেলো। সবাই বললেন : আর-না, এবার খেলা বন্ধ হোক। মিস্টার ফগকে যাত্রার জন্যে তৈরি হতে হবে তো।

খেলতে-খেলতেই ফগ বললেন : আমি তো তৈরিই আছি!

সোয়া-সাতটার সময় তাশ খেলা ছেড়ে ফগ উঠে দাঁড়ালেন। হুইস্টের বাজি জিতে যে-তিনশো টাকা পেয়েছিলেন, তা কোটের পকেটে রেখে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। পৌনে আটটার সময় ফগকে বাড়ি পৌঁছুতে দেখে পাসপার্তু আশ্চর্য হলো--রুটিন অনুযায়ী তার তো রাতদুপুরের আগে বাড়ি ফেরার কথা নয়!

ফগ নিজের ঘরে ঢুকে টেলিফোনে পাসপার্তুকে ডাকলেন। পাসপার্তু ঘরে ঢুকে পকেট থেকে ঘড়ি বার করলে, বললে, এখনও তো রাতদুপুর হয়নি!

সে আমি জানি। দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের ক্যালের দিকে যেতে হবে।

পাসপার্তুকে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফগ আবার বললেন, আশিদিনের মধ্যে আমাকে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে হবে, তাই এক্ষুনি ক্যালে রওনা হতে হবে আমাদের। চলো, ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই।

পাসপার্তু তো একেবারে থ! আশিদিনে সারা দুনিয়া ঘুরে আসা? সে-যে একেবারে অসম্ভব! মাথা খারাপ হয়নি তো ফগের? সদ্য-পাওয়া সাধের চাকরিটা বুঝি প্রথম দিনেই তাকে খোয়াতে হলো!

ফগ কিন্তু সেদিকে খেয়াল না-করে বলে চললেন : জিনিশপত্র বিশেষ-কিছু নিতে হবে না। একটা কার্পেটের ব্যাগে গোটা-দুই শার্ট আর জোড়া-তিনেক মোজা নিলেই চলবে। তোমার জন্যেও তা-ই নিয়ো। আর যা-কিছু দরকার হবে, পথে যেতে-যেতে কিনে নিলেই হবে। আমার ম্যাকিশ আর বড়ো কোটটা নিয়ো। আমাদের অবিশ্যি বেশি হাঁটতে হবে না, তবু যেন দু-জোড়া বুটজুতো সঙ্গে থাকে। এ-কী? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? শিগগির করো, শিগগির।

অবাক পাসপার্তু তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে হতাশভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়লো, আপনমনেই বললো, কপালের লেখা কে খণ্ডাতে পারে। আমার বরাতে বেশ হলো দেখছি! দু-দিন একটু শান্তিতে থাকবো ভেবেছিলুম! এখন খুব হলো।

কিন্তু ভাববার অবসর কই? সময় নেই, এক্ষুনি রওনা হতে হবে। পাসপার্তু দ্রুতহাতে জিনিশপত্র গোছাতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো, আশিদিনে সারা দুনিয়া ঘুরে-আসা! তবে কি আমি পাগলের চাকরি নিলুম? না-না, এ-যে একদম অসম্ভব। এ নিশ্চয়ই একটা

তামাশা। পাঁচ বছর হলো দেশ ছেড়েছি, পাঁচ বছর পর আবার দেশের মুখ দেখতে পাবো—সে হিশেবে ক্যালে যাওয়াটা একরকম ভালোই। পারী দেখতে তিনি অন্তত একবার নিশ্চয়ই সেখানে যাবেন—আর গেলে কি আর দু-দিন না-থেকে পারবেন? কিন্তু তা-ই বা বলা যায় কী করে? যিনি কখনও ঘরের বাইরে পা দেননি, তিনি যখন পৃথিবীভ্রমণে বেরুচ্ছেন, তখন ব্যাপারটা যে আসলে কী, সেইটেই হলো সত্যিকার ভাববার কথা।

আটটার মধ্যেই পাসপার্তু জিনিশপত্র ব্যাগে ভরে তৈরি হয়ে নিলে, আর অস্থির মনে ঘরের দরজা বন্ধ করে ফগের কাছে এসে দাঁড়ালে। ফগ এর মধ্যেই তৈরি হয়ে নিয়েছিলেন। হাতে ছিলো ব্রডশ-র কন্টিনেন্টাল গাইড। পাসপার্তুর কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে তার ভিতর একতাড়া ব্যাংক-নোট রেখে বললেন, কি? সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো? ব্যাগটা নাও। সাবধানে রেখো–এর মধ্যেই কিন্তু তিন লাখ টাকার নোট রইলো।

তিন লাখ টাকা। ব্যাগটা পাসপার্তর কাছে হঠাৎ যেন বিষম ভারি হয়ে উঠলো, মনে হলো, হাত বুঝি অবশ হয়ে এলিয়ে যাচ্ছে, বুঝি আর হাতে ধরে রাখতে পারা যাচ্ছে না।

দু-জনে নিচে নামলেন। দরজায় তালা পড়লো। একটা গাড়ি ডেকে চ্যারিংক্রস স্টেশনের দিকে রওনা হলেন তারা। প্রায় সাড়ে-আটটায় ফগ আর পাসপার্তু স্টেশনের ভিতর প্রবেশ করলেন। একটি ভিখিরি এসে হাত পেতে দাঁড়াতেই ফগ পকেট থেকে হুইস্টের বাজি-জিতে-পাওয়া টাকা ক-টা দিয়ে দিলেন—আর পাসপার্তু তার এই দান দেখে ফগকে অত্যন্ত ভালোবেসে ফেললো।

পাসপার্তু পারীর জন্যে দুটো ফার্স্টক্লাসের টিকিট কিনে আনতে গেলো। এমন সময় রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরা ফগকে সী-অফ করতে স্টেশনে এসে হাজির হলেন। তাদের দেখে ফগ বললেন, এই দেখুন, আমি তো এক্ষুনি যাত্রা করছি। আমার পাসপোর্টে কন্সলের সই দেখলেই তো আপনাদের আর সন্দেহের কারণ থাকবে না?

র‍্যাল্‌ফ নকণ্ঠে বললেন : না, না—পাগল হলেন নাকি? আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট–পাসপোর্টের ছাপটাপের আর দরকার কী?

বন্ধুকে সতর্ক করে দিলেন। কবে ফেরবার কথা তা যেন ভুলে যাবেন না।

আঠারোশো বাহাত্তর সালের একুশে ডিসেম্বর পৌনে-ন-টা। আশা করি মনে থাকবে। আচ্ছা, চলি।

পৌনে ন-টার সময় ডোভার মেল ছাড়লো। অন্ধকার রাত্রি, তার উপর টিপটিপ করে বৃষ্টিও পড়ছিলো তখন। হঠাৎ পাসপার্তু চেঁচিয়ে উঠলো : হায়-হায়! তাড়াতাড়িতে আমার ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিতে ভুলে এসেছি।

ফগ শান্ত নির্বিকার গলায় বললেন, বেশ। আমরা যদ্দিন না-ফিরছি বাতিটা একটানা জ্বলতেই থাকবে। বিজলির বিলের দামটা অবিশ্যি তোমাকেই দিতে হবে। ডোভার মেলটা তখন যদি হঠাৎ থামতে, পাসপার্তু নিশ্চয়ই বিজলির চাইতেও দ্রুতবেগে দৌড়ে ঘরে ফিরে যেতো। গিয়ে বাতিটা নিবিয়ে, দিতো। কিন্তু, একঘেয়ে শব্দ করে ডোভার মেল দ্রুতবেগে ছুটেই চললো, অন্ধকার ছুঁড়ে সোজা সামনের দিকেই।

২. মিস্টার ফিক্স, ডিটেকটিভ

ফগ জানতেন তার এই বাজি নিয়ে বিলেতে রীতিমত একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে। হলোও তাই। এই অদ্ভুত বাজির কথা যখন খবরের কাগজে বেরুলো, তখন সারা ইংল্যাণ্ড আর আয়ারল্যাণ্ডে একটা তুমুল শোরগোল পড়ে গেলো। যে শুনলো, সেই নানান রকম যুক্তি-তর্ক দিয়ে এই দুঃসাহসিক পর্যটনের পরিণাম আলোচনা করতে লাগলো। কেউকেউ বললে, ফগ নিশ্চয়ই সফল হবেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকেই বললে, এমন অসম্ভব ব্যাপার কখনো সম্ভব হবে না—ফগের পরাজয় সুনিশ্চিত। অনেকে আবার বললে, এ ফগের পাগলামি ছাড়া আর-কিছু না। টাইমস, স্ট্যাণ্ডার্ড, মনিংক্রনিকল ইত্যাদি খান-কুড়ি পত্র-পত্রিকা জানালে যে, এ-রকমটা ককখনো হবে না, ফিলিয়াস ফগের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। শুধু ডেইলি টেলিগ্রাফ ফিলিয়াস ফগের পক্ষ নিলে। অনেকে বললে; ফিলিয়াস ফগ একটা বদ্ধপাগল। আর রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরাও ডাহাউন্মাদ। মাথাখারাপ না-হলে কি কেউ কখনও এমনতর অসম্ভব ব্যাপারে বাজি ধরে? কেউ-কেউ তো বললে, ফিলিয়াস ফগ বলেই কেউ নেই, ও-সব কাগজওলাদের কাটতি বাড়াবার চাল।

ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজে যখন ফিলিয়াস ফগের ছবি বেরুলো, তখন কেউকেউ এবং অনেক মহিলা ফগকে সমর্থন করলেন। কেউ-কেউ এ-কথাও বললেন, দুনিয়ায় কত আশ্চর্য ব্যাপারই তো ঘটছে, তাহলে আর এমনটা হতে বাধা কোথায়?

সাতুই অক্টোবর রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় একটা বিরাট প্রবন্ধ বেরুলো। প্রবন্ধলেখক বিরাট এক ফিরিস্তি দিয়ে উপসংহারে জানালেন যে, আশিদিনে পৃথিবী-পরিক্রমার ব্যাপারটা এক উম্মাদ ছাড়া আর-কারু পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয়।

প্রবন্ধটি বিলেতের সকল কাগজেই পুনর্মুদ্রিত হলো। আগে এই ব্যাপারে লোকে যে-সব বাজি ধরেছিলো, এই প্রবন্ধে ফিলিয়াসের নিশ্চিত পরাজয় জেনে প্রায় সকলেই সেই বাজি প্রত্যাহার করলো। সপ্তাহখানেক যেতে-না-যেতেই ফগের দল একান্ত দুর্বল হয়ে পড়লো।

এমন সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বোকর্তা নিচের টেলিগ্রামটা পেলেন :

ব্যাংকের নোট-চোর ফিলিয়াস ফগের খোঁজ পেয়েছি। ওকে বম্বাইয়ে গ্রেপ্তার করার জন্যে পরোয়ানা চাই।–ডিটেকটিভ ফিক্স।

এই টেলিগ্রামের খবরও ছড়িয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না। মুহূর্তমধ্যে ফিলিয়াস ফগ ঘৃণ্য ব্যাংক-দস্যু বলে পরিচিত হয়ে পড়লেন। রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদের ছবির মধ্যে ফিলিয়াস ফগের যে-ছবি ছিলো, লোকে উৎসুক হয়ে সেই ছবির সঙ্গে দস্যুর চেহারা মিলিয়ে সমস্বরে বলে উঠলো : এ-কী! ফিলিয়াস ফগ তবে দস্যু! সর্বনাশ! লোকটা কী চালাক! কেউ-কেউ বললে : ফিলিয়াস ফগ যে একটা দস্যু এতো আগেই জানতুম। দস্যু না-হলে কি কেউ এমন একলা থাকে—ত্রিসংসারে কারু সঙ্গে মেলামেশা করে না। অনেকে বললে : অবাক কাণ্ড! ফিলিয়াস ফগ যে এত ভয়ানক লোক তা তো জানতুম না! যেই ব্যাংকের টাকাটা হাতে পড়েছে, অমনি পৃথিবী পরিভ্রমণের একটা ছুতো করে সটকে পড়েছে, যাতে পুলিশ তার আর কোনো খোঁজ না-পায়! ওঃ! কী সাংঘাতিক!

বরাত বলে যে একটা-কিছু রহস্যময় ব্যাপার আছে তা লোকের সঙ্গে-সঙ্গেই থাকে। ফিলিয়াস ফগের অদৃষ্টও নিশ্চয়ই তার সঙ্গে-সঙ্গেই ছিলো, মিস্টার ফি ডিটেকটিভের

বরাতও তাঁর কাছ-ছাড়া হয়নি। তবু দুজনের বরাত যে এমনিভাবে জড়িয়েমড়িয়ে জট পাকিয়ে পড়বে, তা আগে কে জানতো?

পি. অ্যাণ্ড ও. কম্পানির যতগুলো জাহাজ ছিলো, তার মধ্যে মংগোলিয়াই সবচেয়ে দ্রুত চলতে পারতো! নয়ই অক্টোবর বুধবার সুয়েজ-বন্দরে মংগোলিয়া জাহাজের পৌঁছুবার কথা বলে জাহাজের প্রতীক্ষয় জাহাজ-ঘাট লোকে লোকারণ্য হয়েছে। সকলের মুখেই এককথা : ঐ এলো। ঐ এলো!

জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে শ্রান্ত হয়ে দুই ভদ্রলোক সেই ভিড় ঠেলে জেটির ধারে পায়চারি করছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন সুয়েজের ইংরেজ কন্সাল। অন্যজন একটু বেঁটেখাটো ও শীর্ণ দেখতে—তবে মুখে-চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। কীসের যেন একটা চিন্তা ভদ্রলোককে এতই অধীর করেছিলো যে কিছুতেই একটুও সুস্থির হতে পারছিলেন না। এঁরই নাম মিস্টার ফিক্স, ডিটেকটিভ, ব্যাংক-দস্যুকে ধরবার জন্যে পোর্টসুয়েজে এঁকেই প্যঠানো হয়েছিলো।

ব্যাকুল আগ্রহে মংগোলিয়া জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে ফিক্স কন্সালকে বললেন : আপনি তাহলে বলতে চান, মংগোলিয়ার কখনও দেরি হয় না?

না, কখনও দেরি হয় না। মংগোলিয়া কাল পোর্ট-সয়ীদ ছেড়েছে। অত-বড়ো একটা জাহাজের কাছে সুয়েজ ক্যানাল আর কতটুকু পথ? ঠিক সময়ের আগে পৌঁছুলে গবর্মেন্ট প্রত্যেকবার চারশো টাকা পুরস্কার দিয়ে থাকেন। আমি তো জানি মংগোলিয়াই বরাবর সে-টাকা পেয়ে এসেছে।

মংগোলিয়া কি বরাবর ব্রিন্দিসি থেকে আসে?

হ্যাঁ। ভারতবর্ষের ডাক ব্রিলিসিতেই জাহাজে ওঠে। শনিবার বিকেল পাঁচটায় জাহাজ ছেড়েছে-এই এলো বলে। অত ব্যাকুল হবার কী আছে? আপনি অত ব্যস্ত হবেন না। আচ্ছা, ব্যাংক-দস্যু যদি সত্যি-সত্যিই জাহাজে থাকে, আপনি দস্যুর চেহারার যেবর্ণনা পেয়েছেন, তা থেকেই তাকে চিনে নিতে পারবেন? ও-রকম কোনো ধূর্ত দস্যুকে কি অত সহজে শনাক্ত করা যাবে? আমার তো তা মনে হয় না

চেহারা কি আমার মনই তাকে চিনিয়ে দেবে। চোখে না-দেখেও যেমন কখনোকখনো গায়ের গন্ধে মানুষ চেনা যায়, এ-ও ঠিক তেমনি। হাজার-হাজার চোর দেখেছি আমি। যদি এই জাহাজে সে এসে থাকে তবে আমায় সে কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবে না।

উঃ! কী সাংঘাতিক চুরি! ঈশ্বর করুন, আপনি যেন চোরকে ধরতে পারেন।

সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক! এমন চুরি ক-টা হয়? ভাবুন দেখি, নগদ সাড়েআট লাখ টাকা! এ কি যেমন-তেমন কথা! যদি ধরতে পারি, পুরস্কারও পাবো অঢেল। এমন সুযোগ জীবনে আসে ক-বার? আজকাল যে কেমন হয়েছে, এমন জাহাবাজ চোর বড়ো-একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আজকাল শুধু গোটাকতক ছিচকে চোর আর পুঁচকে চুরিই জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমাদের।

বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন আপনি। আপনি যদি ধরতে পারেন, তবে তো ভালোই হয়। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে কাজটা অত সহজ হবে না। আপনি যার চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন তিনি হয়তো নেহাৎই নিরীহ একজন নির্বিরোধী নির্দোষ ভদ্রলোক।

বড়ো-বড়ো চোরদের বাইরে থেকে দেখতে নিরীহ ভদ্রলোকই লাগে। ডাকাতের মতো চেহারা যার, সে কি আর সাহস করে চুরি করতে পারে? চেহারা দেখেই যে লোকে আগেভাগেই তাকে সন্দেহ করবে। ভণ্ড সাধুতার মুখোশ খুলে ফেলাই আমাদের কাজ- আর গোয়েন্দার কাজের সত্যিকার বাহাদুরি তো তাতেই!

জেটির উপর ভিড় তখন বেড়েই চলছিলো।

দিনটাও ছিলো সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন। পূবদিক থেকে সমুদ্রের সোঁদা-গন্ধ-মাখা হাওয়া বইছিলো ধীরে-ধীরে।

জেটির ঘড়িতে সাড়ে-দশটা বেজে গেলো।

ব্যগ্র হয়ে উঠলেন ফিক্স। না, এ-জাহাজ আজ আর আসবে না দেখছি!

কন্সাল বললেন : উঁহু, ভাববেন না। আর বেশি দেরি নেই।

সুয়েজে কতক্ষণের জন্য নোঙর করবে?

ঘণ্টা-চারেকের জন্যে। এখানেই কয়লা তোলে জাহাজে। সুয়েজ থেকে এডেন তেরোশো দশ মাইল দূরে। বুঝতেই তো পারছেন, কত কয়লা লাগে।

সুয়েজ থেকেই বুঝি সরাসরি বম্বাই যায়?

হ্যাঁ, একদম বম্বাই। পথে আর-কোথাও দাঁড়ায় না।

তা-ই তো! ডাকাতটা যদি এই পথেই মংগোলিয়া জাহাজে এসে থাকে, তবে ইংরেজ-পুলিশকে ফাঁকি দেয়ার মৎলবে সুয়েজেই নামবে। তারপর এখান থেকে দিনেমার কি ফরাশিদের কোনো-একটা কাছাকাছি উপনিবেশে যাওয়ার চেষ্টা করবে। ভারতবর্ষ তো ইংরেজের অধীন-সেখানে গেলে যে তার কোনো সুবিধে হবে না, তা সে বেশ ভালো করেই জানে।

লোকটা যে অত চালাক, আমার তা মনে হয় না। চালাক হলে আসবে কেন অ্যান্দুর? লণ্ডনেই তো লুকিয়ে থাকা সবচেয়ে সহজ। অত বিরাট শহরে কে তাকে খুঁজে বার করবে? খড়ের গাদায় কি আর ছুঁচ খুঁজে পাওয়া যায়? এই কথা বলে কন্সাল গোয়েন্দাবাহাদুর ফিক্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন। তার কথায় ফিক্সের চিন্তা আরো বেড়ে উঠলো।

একটু বাদেই ঘন-ঘন সিটি শোনা গেলো। যে যেখানে ছিলো সবাই দ্রুতপায়ে ছুটলো জেটির দিকে। তীরের নৌকাগুলো সঙ্গে-সঙ্গে নোঙর তুলে বাঁধন খুলে মংগোলিয়ার দিকে এগুলো। ঠিক এগারোটার সময় মংগোলিয়া নির্দিষ্ট জায়গায় নোঙর ফেলে চোঙ দিয়ে হুঁশ-হুঁশ করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো।

অনেক যাত্রী ছিলো জাহাজে। কেউ-কেউ জাহাজের ডেক থেকেই চারদিকের দৃশ্য দেখতে লাগলো, কেউ-বা নৌকোয় চড়ে এলো তীরে। ফিক্স খুব সাবধানে প্রত্যেক আরোহীকে দেখতে লাগলেন। ব্যাংকদস্যুর সন্ধানে তিনি যখন খুবই শশব্যস্ত, তখন

একজন যাত্রী ভিড় ঠেলে তার কাছে এসে তাকেই শুধোলেন, মশায়, বলতে পারেন ইংরেজ সরকারের কন্সাল আপিশটা কোথায়? কথা বলতে-বলতে আগন্তুক একটা পাসপোর্ট বার করে বললেন, আমি এই পাসপোর্টে কন্সলের সই নিতে চাই।

ফিক্স পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে পড়লেন। অমনি কেঁপে উঠলো তার হাত। কী তাজ্জব ব্যাপার! এ-যে সেই দস্যুরই পাসপোর্ট! এতে যার ছবি রয়েছে, দস্যুরও ছবি যে ঠিক তেমনি। ফিক্স আগন্তুকের দিকে তাকালেন। বললেন : এ তো তোমার পাসপোর্ট নয়!

না, এটা আমার মনিবের।

তিনি কোথায়?

জাহাজে আছেন।

তাকেই কাল আপিশে যেতে হবে, তুমি গেলে চলবে না।

আপিশটা কোথায়?

সামনের একটা বাড়ি দেখিয়ে ফিক্স বললেন : ঐ সামনের মোড়টায়-ঐ-যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছো, ঐটেই।

তাহলে আমি যাই, তাকেই আনি-গে। এই বলে আগন্তুক ফের জাহাজে প্রত্যাবর্তন করলো।

ফিক্স আর বিন্দুমাত্র দেরি না-করে কন্সলের কাছে গিয়ে বললেন, আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে মাপ করবেন। নোট-চোর যে মংগোলিয়াতেই আছে, আমি তার বিশেষ প্রমাণ পেয়েছি। এই বলে যা-যা ঘটেছে, সব বিস্তারিতভাবে খুলে বললেন।

সব শুনে কন্সাল বললেন : তাহলে সে এখানেই আসছে? কিন্তু সত্যিই যদি সে চোর হয় তাহলে সে কখনও এখানে আসবে না।

যদি তার ঘটে একটুও বুদ্ধি থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই আসবে এখানে। তার ঐ পাসপোর্টটা পাঁচজনকে দেখাতে নাকি?

হ্যাঁ। চোর-ডাকাতের পালানোর পথ নিষ্কণ্টক করা, আর ভালো মানুষকে খামকা ঝাটে ফেলা—এ ছাড়া পাসপোর্টের আর-কোনো দরকার আছে নাকি? এর পাসপোর্টটা যে ঠিকই আছে, কোনো জাল পাসপোর্ট নয় তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবু আশা করি, আপনি ওতে সই করবেন না।

কেন? পাসপোর্টে গোলমাল না-থাকলে তো আমাকে সই করতেই হবে।

তা হোক, কিন্তু যতক্ষণ না লণ্ডন থেকে ওয়ারেন্ট পাচ্ছি ততক্ষণ তো দস্যুকে এখানে আটকে রাখতে হবে।

সে হলো আপনার কাজ, আপনি তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমার—কন্সলের কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় করাঘাত হলো। ভৃত্য এসে দুজন অপরিচিত লোককে সেখানে পৌঁছে দিয়ে প্রস্থান করলে। এঁদের একজন একটা পাসপোর্ট নিয়ে সই করাবার জন্যে

কালের হাতে তুলে দিলেন। কন্সল পাসপোর্টটা ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলেন আর ফিক্স নারবে বসে আগন্তুকের আপাদ-মস্তক খুব ভালো করে দেখতে লাগলেন। পাসপোর্ট দেখে কন্সাল শুধোলেন : আপনার নামই ফিলিয়াস ফগ?

হ্যাঁ।

এই লোকটা কি আপনারই সঙ্গে চলেছে? আপনার ভৃত্য?

হ্যাঁ। ওর বাড়ি ফ্রানসে। নাম জাঁ পাসপার্তু।

আপনি লন্ডন থেকে আসছেন? যাবেন কোথায়?

হ্যাঁ, লণ্ডন থেকেই আসছি। যাবো বম্বাই। আমি যে এখানে এসেছি, আপনার সই নিয়ে তার প্রমাণ রাখতে চাই।

এরপর কল আর-কোনো দ্বিরুক্তি না-করে পাসপোর্টে স্বাক্ষর করলেন। ফগ তার ফি চুকিয়ে দিয়ে অভিবাদন করে পাসপার্তুকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

ব্যগ্রকণ্ঠে ফিক্স শুধোলেন : এখন আপনার কী মনে হয়?

চেহারাছিরি দেখে ভদ্রলোককে তো নেহাৎ ভালোমানুষ বলেই মনে হলো।

হতে পারে। কিন্তু সে-কথা হচ্ছে না। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে দর চেহারা কি হুবহু মিলে যাচ্ছে না?

তা অবশ্য মিলছে, তবে সবসময় চেহারার বর্ণনা

বাধা দিয়ে ফিক্স বললেন : সে আমি দেখে নিচ্ছি। ভৃত্যের কাছে ঘেঁসতে অসুবিধে বিশেষ হবে না। লোকটা যখন ফরাশি, তখন কিছুতেই নিশ্চয়ই মুখ বুজে থাকতে পারবে না। আচ্ছা, চলি তবে। এক্ষুনি অবশ্য আবার ফিরে আসবো। ফিল্ম তক্ষুনি পাসপার্তুর খোজে বেরুলেন।

কন্সালের আপিশ থেকে বেরিয়ে ফগ সরাসরি জেটিতেই ফিরলেন। পাসপার্তুকে কতগুলো কাজের ভার দিয়ে সোজা ফিরে গেলেন জাহাজে।

ফিলিয়াস ফগের ডায়রিতে দোসরা অক্টোবর থেকে একুশে ডিসেম্বর অব্দি প্রত্যেক দিনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিলো। কোন মাসে, কোন তারিখে, কোন বারে, ক-টার সময় তাঁকে পারী, ব্রিন্দিসি, সুয়েজ, বম্বাই প্রভৃতি বড়ো-বড়ো জায়গাগুলোয় পৌঁছুতে হবে, তা লেখা ছিলো। কোনো জায়গায় পৌঁছুতে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কত বেশি বা কত কম সময় লাগলো, তাও তিনি লিখছিলেন। জাহাজে এসে ডায়রি বার করলেন তিনি তাতে লেখা ছিলো : দোসরা অক্টোবর বুধবার রাত্রি পৌনে ন-টার সময় লণ্ডন ত্যাগ, বৃহস্পতিবার ভোর আটটা চল্লিশ মিনিটের সময় পারী। শুক্রবার চৌঠা অক্টোবর ভোর ছ-টা পয়ত্রিশে মার্সে-এর পথে তুরীন শহরে আগমন—এবং সাতটা কুড়িতে তুরীন পরিত্যাগ। শনিবার পাঁচুই অক্টোবর বিকেল চারটেয় ব্রিন্দিসি, বিকেল পাঁচটায় মংগোলিয়া জাহাজে যাত্রা। এবার ফগ লিখলেন : বুধবার নয়ই অক্টোবর বেলা এগারোটায় পোর্ট সুয়েজে আগমন। এ পর্যন্ত আসতে লেগেছে সবমিলিয়ে সাড়ে ছ-দিন।

৩. মিস্টার ফিক্সের অনুসন্ধান

একটু পরেই জেটিতে ফিক্সের সঙ্গে পাসপার্তুর দেখা হয়ে গেলো। ফিক্স শুধোলেন : কী-হে? তোমাদের পাসপোর্টে ঠিকঠাক স্বাক্ষর করা হয়েছে তো?

আরে! আপনি যে! ধন্যবাদ! হ্যাঁ, সবই ঠিক হয়েছে।

বম্বাই চলেছে বুঝি?

হ্যাঁ। এত তাড়াতাড়ি আমরা চলেছি যে এখনও আমার কাছে সবই স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। এইটে তো সুয়েজ, কেমন না?

হ্যাঁ, সুয়েজ।

তাহলে আমরা মিশরে, মানে আফ্রিকাতে, এসেছি! সত্যি-সত্যিই কি আমরা এখন আফ্রিকায়? একবার ভাবুন দেখি ব্যাপারখানা! আমার তো ধারণাই ছিলো না যে আমরা কখনও পারীর বাইরে যাবো। সেখানে কতক্ষণই-বা ছিলাম—একটি ঘন্টা মাত্র। এখন আমার বড় আপশোশ হচ্ছে। পারীর সুন্দর-সুন্দর জায়গাগুলো আবার দেখবার ইচ্ছে। হচ্ছে আর কেবলই মন-কেমন করছে!

তাহলে সত্যিই দেখছি তোমাদের বড় তাড়াতাড়ি চলতে হচ্ছে?

আমার আর তাড়াতাড়ি কী, আমার মনিবেরই যত তাড়াতাড়ি। ভালো কথা, আমাকে খান-কয় কামিজ আর একজোড়া জুতো কিনতে হবে। লণ্ডন থেকে রওনা হবার সময় আমাদের সঙ্গে ছোটো-একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

চলো, এক্ষুনি তোমাকে বাজারে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে যা-যা দরকার, সব পাবে।

আপনি অতি সজ্জন। সবিনয়ে বললে পাসপার্তু। আচ্ছা, চলুন তাহলে। একট তাড়াই আছে আমার। জাহাজ-ছাড়ার আগেই আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে কিনা।

ফিক্স বললেন : এখনও জাহাজ ছাড়ার ঢের দেরি আছে। এই তো সবে বারোটা বেজেছে।

পাসপার্তু পকেট থেকে তার প্রকাণ্ড ঘড়িটা বার করলো। ঘড়িটা সম্ভবত তার ঠাকুরদার আমলের। বারোটা বেজেছে! আমার ঘড়িতে তো নটা বাহান্ন বাজে।

বাইরের দিকে পা চালাতে-চালাতে ফিক্স বললেন : তাহলে তোমার ঘড়ি ভুল।

ভুল! পাসপার্তুর গলা কেমন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। ঠাকুর্দার আমল থেকে ঘড়িটা ঠিক সময় দিয়ে আসছে, একটুও এদিক-ওদিক টা-ফোঁ করেনি, আর আজ কিনা ভুল হয়ে গেলো! ইল্লি। বছরে পাঁচমিনিটও এদিক-ওদিক হয় না—আর আজ দু-তিন ঘণ্টার ফারাক হয়ে গেলো! কী বলছেন, মশাই, আপনি? এ কি আমার যে-সে ঘড়ি! ঠিক যেন একটা ক্রনোমিটার?

কেন-যে সময়ের অত তফাৎ হয়েছে, আমি তা বুঝতে পেরেছি, ফিক্স বললেন : তোমার ঘড়িতে লণ্ডনের সময় আছে। সুয়েজের সময় আর লণ্ডনের সময় এক নয়-সুয়েজে যখন বারোটা, তখন লণ্ডনে প্রায়-দশটা। যেখানেই যাও, বেলা ঠিক বারোটার সময় সেই দেশের ঘড়ির সঙ্গে নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিয়ো–তাহলেই ঠিক সময় থাকবে।

বললেই হলো আর-কি। চাইনে আমি অন্য দেশের সময়। আমার ঘড়ি যেমন আছে, তেমনি থাক। আমার ঘড়ি কি ভুল হতে পারে, মশায়? সগর্বে পাসপার্তু তার ঘড়িটা পকেটের মধ্যে রেখে দিলে।

ফিক্স শুধোলেন : তোমরা বোধহয় বেজায় তাড়াহুড়ো করেই লণ্ডন থেকে বেরিয়েছো? যাচ্ছো কোথায়?

হ্যাঁ, খুব তাড়াহুড়ো করেই বেরুতে হয়েছে আমাদের। বুধবার রাত ঠিক আটটার সময় আমার মনিব তার ক্লাব থেকে ফিরে এলেন, তারপর ঠিক পৌনে-এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হলো। উনি সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে বেরিয়েছেন কি-না, তাই বরাবর সামনের দিকেই চলেছি আমরা।সোজা নাকবরাবর।

সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে বেরিয়েছেন? বিশ্বপরিভ্রমণে?

হ্যাঁ, তাও আবার মাত্র আশিদিনে। আমাকে বললেন যে, বাজি রেখে এই কাজে হাত দিয়েছেন—কিন্তু, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, আমি এ-কথার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করিনে। মাথার ঠিক থাকলে কি কেউ এমন আজব বাজি ধরে, এমনিতর কাজে হাত দেয়? আমার তো মনে হয় এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে।

ভারি আশ্চর্য মানুষ তো তোমার মনিব! ওঁর জুড়ি মেলা ভার! উনি কি খুব ধনী নাকি।

ধনী বলে ধনী, বিরাট ধনী। টাকার একেবারে কুমির। তার সঙ্গে টাকা কত! সবই টাটকা ব্যাংক-নোট। খরচ করতে তো কুণ্ঠিত দেখিনে কখনও। নির্দিষ্ট সময়ের আগে বম্বাই পৌঁছুতে পারলে মংগোলিয়ার এঞ্জিনম্যানকে ইনাম দেবেন বলেছেন।

তুমি বুঝি অনেকদিন থেকেই এঁর চাকরি করছো?

অনেকদিন? যেদিন আমরা লণ্ডন ছেড়েছি, ঠিক সেদিন থেকেই আমার চাকরির শুরু!

পাসপার্তুর কথা শুনে ফিক্সের মন যে কীভাবে আলোড়িত হলো, তা সহজেই অনুমেয়। ব্যাংকে চুরি হওয়ার পরেই অত তাড়াহুড়ো করে লণ্ডন থেকে বেরিয়ে-পড়া, সঙ্গে কাড়িকাড়ি ব্যাংক-নোট, একটা বাজির ভান করে ভারতবর্ষে পৌঁছুনোর জন্যে এমন অধীর ব্যগ্রতা-এ-সমস্তই ফিক্সের সন্দেহকে আরো-সুদৃঢ় করে তুললো। আরো বিশদভাবে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে ফিক্স পাসপার্তুর সঙ্গে নানান কথা বলতে লাগলেন।

পাসপার্তু শুধোলে : বম্বাই তো ভারতবর্ষে, মানে এশিয়ায়? এখান থেকে বুঝি। অনেক দূর?

নেহাৎ কাছে নয়, জাহাজে দিন-দশেক লাগে।

উঃ! বাতিটার কথাই আমার দিনরাত মনে হচ্ছে!

বাতি? কীসের বাতি?

বিজলি বাতি। এমন তাড়াহুড়ো করে বেরুতে হয়েছিলো যে বেরুবার সময় বাতিটা যে নেভাতে হবে, সে-কথাই খেয়াল ছিলো না। যখন খেয়াল হলো, তখন বেজায় দেরি হয়ে গিয়েছে। মুখ ফসকে কথাটা যেই বলেছি, অমনি কর্তা জানালেন, বাতিটা তো জ্বলছে আমারই দোষে, ফলে আমার ভুলের মাশুল আমাকেই গুনতে হবে—যা বিল উঠবে, সবই দিতে হবে আমাকে! তা, ভেবে দেখুন, দিনে দু শিলিং করে গচ্চা দিতে হচ্ছে। ধরুন, যদি আশিদিন পরে ফিরেও আসি, কত টাকা আমায় মিছেমিছি খেসারৎ দিতে হবে। শুধু মুহূর্তের একটা ভুলে এতগুলো টাকা গুনাগার–

পাসপার্তুর ঘ্যানঘ্যান বাহাদুর গোয়েন্দা ফিক্সের কানের পোকাগুলোকেও যেন নড়িয়ে দিচ্ছিলো তখন। পাসপার্তুতে কত টাকা গচ্চা দিতে হবে, তাতে ফিক্সের কী! ফিক্স এখন আকাশে মস্ত একটা কেল্লা বানাচ্ছেন—ব্যাংককে পাকড়াতে পারলে কত টাকা পাবেন, তিনি তখন তার ভাবনাতেই মশগুল। ইনামের সঙ্গে-সঙ্গে নামও হবে তাঁর, কাগজে-কাগজে ছবি বেরুবে। সবাই তাকে একডাকে চিনতে পারবে। আহা, কবে যে চোরটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিতে পারবেন।

পাসপার্তু তখন তার নিজের নামের মানে সাতকাহন করে ব্যাখ্যান করতে লেগেছে। তার নামের মানে সবখোল চাবি হলে কী হয়, নিজের কপালটাতেই সে কুলুপ এঁটে রেখেছে! নামের অবশ্য আরেকটি অর্থও হয়-ছবি বাঁধিয়ে রাখার ফ্রেম–তা সে নিশ্চয়ই নিজের ভাগ্যটাকেই এখন ফ্রেমে পুরে টাঙিয়ে রেখেছে। কোথায় সবখানে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াবে

এই সবখোল চাবি, সব কুলুপে ঢুকে পড়বে অনায়াসে—না, বাঁধানো একখানা ছবি হয়েই শোভা বাড়াচ্ছে তার দুর্ভাগ্যের।

পাসপার্তুর নাকিকান্নাকে মোটেই প্রশ্রয় না-দিয়ে বাহাদুর গোয়েন্দা ফিক্সসাহেব পাসপার্তুকে নিয়ে গিয়ে তার যা-যা কেনাকাটা করার ছিলো, সেগুলো দরদাম করে, শস্তায় দাঁও বাগাবার ভঙ্গি করে, পাসপার্তুর কৃতজ্ঞতা অর্জন করে, অতঃপর তার কাছ থেকে বেশ অন্তরঙ্গভাবেই বিদায় নিলেন। এবং সটান পুর্নবার এসে হাজির হলেন কলের কাছে।

অতঃপর কন্সালের সঙ্গে ফিক্সের যা কথাবার্তা হলো, তা এইরকম:

না, না, কন্সাল। আমার আর-কোনো সন্দেহই নেই। যার জন্যে অ্যাদ্দিন হা-পিত্যেশ করে বসেছিলুম, সে-ই এখন সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়েছে। লোকটি কিরকম ফেরেব্বাজ দেখুন-গুল দিয়ে বেড়াচ্ছে, সে না কি আশিদিনে আস্ত পৃথিবী ঘুরে আসবে। আরে, এ-যে তার একটা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়, সে কি আর আমার বুঝতে দেরি আছে? ও-রকম বুজরুকি আমি ঢের-ঢের দেখেছি।

আপনার কথা ঠিক হলে বলতেই হয় লোকটা আসলে ধূর্তের শিরোমণি, সে এত দেশ-বিদেশ ঘুরে শেষকালে খোদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চোখেই ধুলো দিয়ে লণ্ডন ফিরতে চায়!
বইটি আমারবই.কম এর জন্য নির্মিত।

কী করে ফেরে, দেখবো।

কিন্তু আপনার কোনো ভুল হয়নি তো?

আমার ভুল? ফি যেন বিষম অপমানিত বোধ করলেন। আর যারই ভুল হোক, ডিটেকটিভ ফিক্সের কখনও ভুল হয় না। ফিক্স উইল ফিক্স হিমইভেনচুয়্যালি।

কিন্তু সে-যে সুয়েজ পেরিয়ে যাচ্ছে, তা সে প্রমাণ করবার জন্যে এমন উঠেপড়ে লেগেছে কেন?

আসল কারণ জানিনে। তবে ধাপ্পাটা বজায় রাখবার জন্যেই হয়তো। হয়তো এই ভাণটা বাহাল রাখতে চায় যে সে পৃথিবীভ্রমণেই বেরিয়েছে। যাক, আমি এক্ষুনি লণ্ডনে তাড়া দিয়ে তার করছি যাতে বম্বাইতে ওয়ারেন্টটা পেয়ে যাই। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে বাছাধনকে পাকড়াতে হবে। আমিও মংগোলিয়ায় এই ব্যাংকদস্যুর সহযাত্রী হবো। দেখবো, কী করে আমার কবল থেকে সে পালায়।

বলে কন্সলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিক্স প্রথমে গেলেন ডাক ও তারের আপিশে-লণ্ডনে টেলিগ্রাফ পাঠালেন তিনি, যাতে বম্বাইতে নামবামাত্র ওয়ারেন্ট হাতে পান। তারপর ছোট্ট একটা ব্যাগে নিজের জামাকাপড় পুরে সোজা গিয়ে হাজির হলেন মংগোলিয়ায়। একেবারে ঠিক সময়েই পৌঁছেছিলেন। একটু বাদেই চোঙ দিয়ে কালোধোঁয়া ওগরাতে-ওগরাতে মংগোলিয়া নীল সমুদ্রে পাড়ি জমালে।

সুয়েজ থেকে এডেন তেরোশো দশ মাইল দূরে, কম্পানির সব জাহাজই অতটা পথ সবমিলিয়ে একশো আটত্রিশ ঘটায় পেরিয়ে আসে।

জাহাজে উঠেই ফিলিয়াস ফগ বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছেন—বন্ধু মানে তাশুঁড়ে, যাঁদের সঙ্গে বসে-বসে তিনি হুইস্ট খেলবেন। জাহাজেরই সঙ্গী সবাই-জীবনে এই-প্রথমবার তাদের তিনি চর্মচক্ষে দেখলেন। ডেকে গিয়ে পায়চারি করার বদলে, অন্তহীন নীল জলের একঘেয়ে উচ্ছ্বাস দেখার বদলে, হরতন রুহিতন চিড়েন ইকাবনেই ফিলিয়াস ফগের আগ্রহ বেশি। টেক্কা-সাহেব-বিবি-গোলাম-এ-সব হাতে থাকলে তার ককখনও একঘেয়ে বা অসহ্য লাগে না।

পাসপার্তুও আচমকা-এই-সমুদ্রযাত্রাকে শেষটায়, খুশিমনেই, মেনে নিয়েছে। দিব্বি কোনো কাজকর্ম নেই, ফাইফরমাশ খাটা নেই, জাহাজের সেলুনে আর ডাইনিংরুমে ভালোমন্দ গেলো, আর হজমের যাতে গোলমাল না-হয়, বাকি সময়টা ডেকে পায়চারি করে বেড়াও।

আর সুয়েজ থেকে বেরুবার পরের দিনই পায়চারি করতে গিয়ে পাসপার্তুর সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে গেলো ফিরে। দেখেই, পাসপার্তু গায়ে পড়েই এগিয়ে গেলো ফিক্সের দিকে। আপনার সঙ্গেই তো সুয়েজের জাহাজঘাটায় দেখা হয়েছিলো, তাই না?

আরে, তা-ই তো বটে। তুমিই সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছো–

আপনি ঠিকই ধরেছেন মিস্টার—

আমার নাম ফিক্স।

মিস্টার ফিক্স, আপনাকে জাহাজে দেখে খুব খুশি হলাম। যাচ্ছেন কোথায়?

বম্বাই।

বাঃ, ভালোই হলো। আপনি কি আগে আর-কখনও বম্বাই গিয়েছিলেন?

অনেকবার। পি, অ্যাণ্ড ও. কম্পানির আমি একজন এজেন্ট কি-না। আমাকে তো আখছার নানা জায়গায় যেতে হয়।

ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনি তাহলে পরিচিত দেখছি। ভারতবর্ষ ভারি-একটা আজব দেশ, কেমন না?

তা একরকম আজব দেশ বলতে পারো। ফিক্স তার পুঁথি-পড়া বিদ্যেকে স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন। সেখানে কত মন্দির মশজিদ মিনার আছে। কত সাপ-বাঘ সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তা মিস্টার ফগ ভালো আছেন তো?

বেশ সুস্থ আছেন। আমিও ভালোই আছি। ঠিক রাক্ষসের মতো খাচ্ছি আজকাল। সমুদ্রের হাওয়া বোধহয় খিদে বাড়ায়।

কই, তোমার মনিব তো কখনও ডেকে আসেন না?

না। এসব বিষয়ে তার মোটেই কোনো কৌতূহল নেই।

আমার মনে হয়, এই আশিদিনে সারা দুনিয়া ঘুরে আসার ব্যাপারটা একটা ভান মাত্র। এর ভেতরে নিশ্চয়ই বিশেষ-কোনো-একটা গুরুতর বিষয় লুকোনো আছে। তুমি কী বলে?

শপথ করে বলতে পারি, আমি এ-সবের কিছুই জানি না। আর সে-বিষয়ে কিছু জানবার আগ্রহও নেই আমার।

তখনকার মতো কথাবার্তা এখানেই শেষ হলো। কিন্তু পরে সুযোগ পেলেই ফিক্স পাসপার্তুর কাছ থেকে খবর বার করবার চেষ্টা করতেন। সেজন্য মাঝে-মাঝে দু-এক গেলাশ মদ্যপান করতে আমন্ত্রণ জানাতেন তিনি। মদিরা সেবনে পাসপার্তুর কখনোই কোনো অনীহা নেই। সে ভাবতো, বাঃ, লোকটা কী ভদ্র, অমায়িক, এমন ভদ্রলোক তোত সচরাচর দেখা যায় না!

দ্রুতগামী মংগোলিয়া মোম্বাসা ছাড়লো, বেবেলমণ্ডেব ছাড়লো, ক্রমে-ক্রমে এড়েন বন্দরের উত্তরে অবস্থিত স্টীমার-পয়েন্ট ছাড়িয়ে এলো। বম্বাই তখনও যোলোশো-পঞ্চাশ মাইল দূরে। পনেরো তারিখে এডেন পৌঁছুবার কথা হলেও চোদ্দই অক্টোবর সন্ধেবেলাতেই মংগোলিয়া এডেন পৌঁছেছিলো। ফিলিয়াস ফগ তাই পনেরো ঘণ্টার মতো সময় হাতে পেলেন। স্টীমার-পয়েন্টে নেমে ফিলিয়াস ফগ পাসপোর্টে সই করিয়ে এনেছিলেন। বলা বাহুল্য, হুশিয়ার ও ধুরন্ধর ফিক্স অলক্ষ্যে তখন তাকে অনুসরণ করতে ছাড়েননি।

সন্ধে ছটার জাহাজের নোঙর উঠলো। বিপুল ভারত মহাসাগরের উচ্ছ্বসিত নীল জল কেটে তরতর করে বম্বাইয়ের দিকে চললো মংগোলিয়া। তখনও বম্বাই প্রায় একশো সত্তর ঘণ্টার পথ ছিলো।

আকাশ ছিলো পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ। আবহাওয়া ছিলো চমৎকার। আস্তে-আস্তে বাতাস বইছিলো। ক্যাপ্টেন সুযোগ বুঝে পাল তুলে দিলেন। কলে আর পালে দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠলো জাহাজের গতি।

৪. ঘূর্ণিপাকে

যেদিন পৌঁছুবার কথা, তার দু-দিন আগেই মংগোলিয়া বম্বাইয়ের জাহাজ-ঘাটায় এসে ভিড়লো। সন্ধে আটটার সময় কলকাতার ট্রেন ছাড়বে। ফগ হুইস্ট খেলা শেষ করে তীরে নামলেন। পাসপার্তুকে কতগুলো দরকারি জিনিশপত্র কিনতে দিয়ে সময়মতো রেলস্টেশনে হাজির হতে বললেন, তারপর সোজা গেলেন কন্সাল আপিশে। বম্বাইয়ের দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর প্রতি ফগের কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিলো না। তাই কন্সাল আপিশ থেকে বেরিয়ে সোজা স্টেশনেই চলে এলেন তিনি, আর সেখানেই রেলের হোটেলে আহার সমাধা করলেন।

ফিক্স একটু বাদেই জাহাজ থেকে নেমে পুলিশ-আপিশে গেলেন। সেখানে নিজের পরিচয় দিয়ে দস্যুর পশ্চাদ্ধাবনের কাহিনী বর্ণনা করে শুধোলেন : লণ্ডন থেকে কোনো ওয়ারেন্ট এসেছে কি? উত্তরে শুনলেন, না, আসেনি। ওয়ারেন্টটির লণ্ডন থেকে বম্বাইয়ে পৌঁছুবার উপর্যুক্ত সময় তখনও হয়নি। ফিক্স বড় হতাশ হয়ে পড়লেন। তবু পুলিশ কমিশনারের কাছে একটা ওয়ারেন্ট প্রার্থনা করলেন। পুলিশ কমিশনার জানালেন: আমার দেয়ার কোনো এক্তিয়ার নেই।

নিরুপায় হয়ে বিলেতের ওয়ারেন্টের অপেক্ষাতেই রইলেন ফিক্স। দস্যু যাতে পালিয়ে যেতে না-পারে, সেজন্যে রাখলেন কড়া নজর। তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো, ফগ অন্তত দু-চারদিন বম্বাই থাকবেনই। তদ্দিনে নিশ্চয়ই ওয়ারেন্ট এসে উপস্থিত হবে।

পাসপার্তুরও ধারণা ছিলো যে তারা কিছুকাল বম্বাই থাকবে। কিন্তু তার দিবাস্বপ্ন ভেঙে যেতে দেরি হয়নি। সে দেখলো, অন্তত কলকাতা পর্যন্ত যেতেই হচ্ছে-কে বলতে পারে আরো দূর পথ যেতে হবে কি-না। তার ধীরে-ধীরে বিশ্বাস হতে লাগলো, তবে বুঝি বাজির কথা মিথ্যে নয়। সে তার কপাল চাপড়ে পোড়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলো।

ফগের কথামতো জিনিশপত্র কিনে পাসপার্তু রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যত ঘোরাঘুরি করতে লাগলো, ততই তার কৌতূহল বেড়ে চললো। বম্বাইয়ের জাঁকজমক তার চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

রেল-স্টেশনের পথে আসতে-আসতে সে দেখতে পেলে অনতিদূরে মালাবার গিরিশৃঙ্গে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। এমন চকমেলানো সুন্দর মন্দিরটা একবার দেখে যাওয়া দরকার ভেবে সে মন্দিরের দিকে এগুলো।

ফরাশি পাসপার্তু জানতো না যে হিন্দুর মন্দিরে, এমনকী মন্দির-প্রাঙ্গণে পর্যন্ত খ্রিষ্টানরা ঢুকতে পারে না। যারা প্রবেশ করতে পারে, তাদেরও মন্দিরের বাইরে জুতো রেখে প্রবেশ করতে হয়। এই নিয়ম অবহেলা করলে ইংরেজ-আদালতে নিয়মভঙ্গকারীর কঠোর শাস্তি অনিবার্য।

অনভিজ্ঞ পাসপার্তু যখন নিঃসন্দিগ্ধচিতে জুতো পরে মন্দিরপ্রাঙ্গণে ঢুকে সোল্লাসে মনে-মনে মন্দিরের কারুকার্যের প্রশংসা করছিলো, তখন কে যেন এসে চক্ষের পলকে একধাক্কায় তাকে মাটিতে পেড়ে ফেললে। সে তাকিয়ে দেখলে, তিনজন ক্রুদ্ধ হিন্দু তার কাছে দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় তীব্রকণ্ঠে তিরস্কার করছে। না, তিরস্কার বা ভৎসনা নয়–

বিশুদ্ধ গালাগালিই সে-সব। আর গালাগাল বুঝতে বোধহয় ভাষাও জানতেও হয় না। একজন জোর করে তার জুতো খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো; আর অন্য-দুজন তাকে আক্রমণ করে সাংঘাতিকভাবে প্রহার করতে লাগলো।

পাসপার্তু নিজেকে সামলে নিয়ে চক্ষের পলকে উঠে দাঁড়ালে। তারপর দু-চারটে ঘুসি মেরে বিপক্ষদলকে একটু হতচকিত করে দিয়ে তীরবেগে পলায়ন করলে। অমনি চারদিকে ধর-ধর রব উঠলো! কিন্তু পাসপার্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজপথের জনারণ্যে মিশে গেলো, আর কেউ তার সন্ধান পেলো না।

ট্রেন ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে পাসপার্তু হাঁপাতে হাঁপাতে স্টেশনে এসে হাজির হলো। জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফালা-ফালা, মাথায় নেই টুপি, পায়ে নেই জুতো, খালি-পা ক্ষতবিক্ষত। ফগের জন্য যে-সব জিনিশ কেনাকাটা করেছিলো গোলমালের সময় সেগুলো যে কোথায় পড়েছে কে জানে। ফিক্স তখন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফিলিয়াস ফগের কাছেই অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাসপার্তুর দুরবস্থা দেখে তার তো চোখ কপালে উঠলো। পাসপার্ত তার দুর্দশার কাহিনী সংক্ষেপে ফগকে খুলে বললে। ফগ শান্তভাবে গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন : আশা করি এমন কাজ আর-কখনও করবে না। খালিমাথা খালি-পা হতবুদ্ধি পাসপার্তু কী বলবে বুঝতে না-পেরে ফ্যালফ্যাল করে প্রভুর দিকে তাকিয়ে কোনো দ্বিরুক্তি না-করে গাড়িতে উঠে বসলো।

ফিক্সওদস্যুর পশ্চাদ্ধাবন করবার জন্যে সেই ট্রেনেই যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু পাসপার্তুর কাহিনী শুনে মনে-মনে ভাবলেন, দেখা যাক, কী হয়। ঠিক সেইমুহূর্তে

হুইসল দিয়ে বম্বাই মেল কলকাতা যাত্রা করলো।

যে-গাড়িতে ফিলিয়াস ফগ পাসপার্তুকে নিয়ে উঠেছিলেন, সেই গাড়িতেই জেনারেল সার ফ্রান্সিস কোমার্ট ছিলেন। মংগোলিয়া জাহাজে এরই সঙ্গে হুইস্ট খেলতেন ফগ। সার ফ্রান্সিসের জীবনের বেশির ভাগই কেটেছিলো ভারতবর্ষে। ইতিপূর্বেই ফগের বাতিকগুলো লক্ষ করেছিলেন ভদ্রলোক। তার রকম-সকম দেখে অনেক সময় সার ফ্রান্সিসের সন্দেহ হতো, বুঝি এই রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে কোনো প্রাণ নেই—যে-মন প্রকৃতির অফুরন্ত লীলা-সুন্দর রূপ দেখবার জন্যে ব্যাকুল থাকে, সেইরকম কোনো মন বোধহয় নেই ফিলিয়াসের শরীরে। জীবনে অনেক লোক দেখেছেন সার ফ্রান্সিস, কিন্তু ফগের মতো লোক আর-কখনও দ্যাখেননি।

ট্রেন যেমন চলছিলো, তেমনি চললো। দেখতে-দেখতে পেরিয়ে গেলো পশ্চিমঘাট গিরিমালার সুড়ঙ্গ-পথ।

কথা-প্রসঙ্গে সার ফ্রান্সিস বললেন : আর-কিছুদিন আগে হলে আপনাকে কিন্তু বিফল-মনোরথ হতে হতে মিস্টার ফগ, আশিদিনে সারা দুনিয়া ঘুরে আসা সম্ভব হতো না। কারণ, তখন পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্তই চলতো রেল—তারপর আর লাইন ছিলো না। তখন সেখান থেকে পাল্কিতে কিংবা ঘোড়ায় করে যেতে হতো।

ও-সব সামান্য বাধায় আমার অসুবিধে হতো না। পথ চলতে গেলে মাঝে-মধ্যে বাধাবিঘ্ন এসে হাজির হবে, সেটা তো জেনেশুনেই বেরিয়েছি।

আজকেই তো আপনার সব মাটি হতে বসেছিলো। কম্বল মুড়ি দিয়ে পাসপার্তু কুঁকড়েমুকড়ে ঘুম যাচ্ছিলো, তাকে দেখিয়ে সার ফ্রান্সিস বললেন, আপনার ঐ ভৃত্য পাসপার্তু আজ যে-কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছিলো, ব্রিটিশ ভারতে সেই অপরাধ কিন্তু খুবই গুরুতর বলে গণ্য হয়। এ-দেশের লোকের ধর্মবিশ্বাসে যাতে কোনো আঘাত না লাগে, ইংরেজ সরকার সে-বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার ও তৎপর। আজ যদি ও ধরা পড়তে

তাহলে কী আর হতো? এ-দেশের আইন অনুসারে তার শাস্তি হতো। দু-দিন পরেই সে আবার ইওরোপে ফিরে যেতো। ওর জন্য কি আর আমি এখানে বসে থাকতুম? ককখনো না। ওকে ফেলে রেখে একাই চলে যেতুম আমি।

রাত বেড়ে চললো ক্রমশ। সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন। ট্রেন যেমন তীরবেগে ছুটছিলো, তেমনি চললো।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো পাসপার্তুর। ট্রেন আগের মতোই দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। পাসপার্তু গভীর মনোযোগ দিয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো। মল্লিনাথ, ইলোরা, ঔরঙ্গবাদ ছাড়িয়ে বেলা প্রায় সাড়ে-বারোটার সময় বেহরামপুর স্টেশনে এসে ট্রেন থামলো। ঝুটোমোতি-বসানো একজোড়া চপ্পল কিনে পাসপার্তু সগর্বে তার খালি-পা আবৃত করলো।

মালাবারের দুর্ঘটনার পর থেকেই পাসপার্তুর মতি ফিরেছিলো। বম্বাইয়ে আসবার আগে পর্যন্ত তার বিশ্বাস ছিলো, এই আজব ভ্রমণ বুঝি ভারতবর্ষে এসেই শেষ হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের সুন্দর দৃশ্যাবলি তার মনের ঘুমিয়ে-থাকা ছটফটে চঞ্চল ধাতটাকে জাগিয়ে

তুললো, যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনা আবার তার মনে ফিরে এলো। এবার তার বিশ্বাস হলো যে কিলিয়াস ফগের বাজি রাখার কাহিনী পুরোপুরি সত্যি। যে-করেই হোক, আশিদিনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরে আসতেই হবে। এবার ফিলিয়াস ফগের চেয়ে তার অস্থিরতা আর চিন্তাই যেন বেশি হয়ে উঠলো। ঠিক সময়মতো যাওয়া যাবে তো? পথে কোনো বিপদ-আপদ ঘটবে না তো? কোনো কারণে দেরি হয়ে যাবে না তো? বাজি জিততে পারলে কত গৌরব! বম্বাইয়ে তার বোকামির জন্যেই যে সব নষ্ট হতে বসেছিলো, সে-কথা মনে করে এখন তার বিষম লজ্জা হলো, বুক দুরুদুরু করতে লাগলো। কোনো স্টেশনে একটু বেশিক্ষণ ট্রেন দাঁড়ালেই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলো সে। অবশেষে ট্রেনের ড্রাইভারের উদ্দেশে গালি পাড়তে শুরু করলো, আর মনে-মনে বলতে লাগলো : আমার মনিবও যেমন-ড্রাইভারকে কিছু বখশিশ দিলেই তো সে আরো-জোরে গাড়ি ছোটাতো। পুরস্কার পেয়েই তো মংগোলিয়ার ক্যাপ্টেন প্রবলবেগে জাহাজ চালিয়েছিলো!

বাইশে অক্টোবর সকাল আটটার সময় রোহটাস থেকে পনেরো মাইল দূরে গাড়ি থেমে গেলো। গার্ডসাহেব চেঁচিয়ে বললে : নামো, নামা— গাড়ি থেকে নামো! এখানে গাড়ি বদল হবে।

ফিলিয়াস ফগ এ-কথার মানে বুঝতে না-পেরে সবিস্ময়ে সার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকালেন। পাসপার্তু মুহূর্তমধ্যে নেমে গিয়ে পড়িমরি করে খবর নিয়ে ফিরে এলো, ট্রেন আর চলবে না, পথ নেই।

সার ফ্রান্সিস বললেন : বলছো কী তুমি? ট্রেন আর চলবে না? এর মানে? আমি বলছি যে, ট্রেন আর একইঞ্চিও এগুবে না।

তার কথা শুনে ফিলিয়াস ফগ আর সার ফ্রান্সিস হন্তদন্ত হয়ে ট্রেন থেকে নামলেন। সামনে গার্ডকে দেখে সার ফ্রান্সিস শুধোলেন : আমরা কোথায় এসেছি?

খোলবি গাঁয়ে।

এখানে এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে-থাকার কারণ কী?

ওদিকে এখনও রেল-লাইন পাতা হয়নি।

পাতা হয়নি? তার মানে?

এখান থেকে এলাহাবাদ পঞ্চাশ মাইল। এ-পঞ্চাশ মাইল পথে এখনও লাইন বসানো হয়নি। এলাহাবাদ থেকে আবার ট্রেন পাওয়া যাবে।

সার ফ্রান্সিস রেগে উঠেছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বে সাহেবসবো কর্তাব্যক্তিদের রাগ একটু বেশিই হয়।লাইন হয়নি তো বরাবর কলকাতার টিকিট দেয়া হলো কেন? খবরের কাগজে যে লিখেছে লাইন বসানো হয়ে গেছে?

সে আমি কী করবো বলুন? সে হলো খবরের কাগজের দোষ। টিকিট তো সরাসরি কলকাতারই দেয়া হচ্ছে। এ তো সব্বাই জানে যে, যাত্রীরা নিজেদের ব্যবস্থামতো খোলবি থেকে এলাহাবাদ যায়।

গার্ডের কথা শুনে সার ফ্রান্সিসের রক্তচাপ মাথায় উঠলো, রাগ সব সীমা ছাড়ালো। যদি পারত, তাহলে পাসপার্তু তক্ষুনি গার্ডকেই উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিয়ে বসতো।

ফিলিয়াস ফগ বললেন : চলুন, সার ফ্রান্সিস। যে-করেই হোক এলাহাবাদ তো যেতেই হবে। দেখা যাক, কোনো উপায় হয় কি না।

এখন আর কী ব্যবস্থাই-বা করা যাবে? যা দেখছি, তাতে মনে হয় এখানেই আপনার বাজির দফা রফা।

ও কিছু না। ও-জন্যে ভাববেন না। পথেঘাটে দেরি যে কিছু হবে, সে আমি আগেই ভেবে দেখেছি।

সে-কী? সবিস্ময়ে সার ফ্রান্সিস বললেন : লাইন যে তৈরি হয়নি, সেটা কি তবে আগেই জানা ছিলো আপনার?

না, তা ছিলো না। তবে আমার যাত্রাপথে যে অনেক অভাবিত বাধাবিপত্তি এসে দাঁড়াতে পারে, সে-সম্বন্ধে আমার মনে কখনও কোনো সন্দেহ ছিলো না।

কলকাতার ট্রেন ধরতে না-পারলে যে আপনার সর্বস্ব যাবে!

ট্রেন ধরতে পারবোই। ছাব্বিশে দুপুরের আগে কলকাতা থেকে হংকং-এর জাহাজ ছাড়বে না। আজ তো কেবল বাইশে। এখনও ঢের সময় আছে।

এমন চাঞ্চল্যবিহীন নিশ্চিন্ত উত্তরের আর-কোনো জবাব দেয়া যায় না। অন্যান্য যাত্রীদের অনেকেই এ-কথা জানতো যে, খোলবিতেই গাড়ি-বদল করতে হয়। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলো। কারু জন্যে ঘোড়া, কারু জন্যে বা গোরুর গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। যাত্রীরা নিজের নিজের যানবাহন নিয়ে প্রস্থান করলো। ফিলিয়াস ফগ আর সার ফ্রান্সিস কোনোরকম যানবাহনই পেলেন না।

ফগ তখন বললেন : যখন কোনো যানের সুবিধে নেই, তখন আর উপায় কী? আমি হেঁটেই যাবো! পায়দলে।

এই কথা শুনে পাসপার্তু তার মোতিবসানো চপ্পলজোড়ার দিকে তাকালে একবার।

অল্পক্ষণ পরে পাসপার্তু এসে খবর দিলে আমাদের যাবার একটা হিললে হয়েছে। একটা হাতি আছে এখানে।

চলো, দেখে আসা যাক।

স্টেশনের কাছেই সেই হাতির মালিক থাকতো। পাসপার্তু ফিলিয়াস ফগ আর সার ফ্রান্সিসকে নিয়ে সেখানে গেলো। নধরকান্তি মাতঙ্গপ্রবরের দিকে তাকিয়ে ফগ বুঝলেন, হাতিটি তাদের এলাহাবাদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে। মালিককে জিগেস করলেন : তোমার হাতির নাম কী?

কিউনি।

তোমার ঐ কিউনি চলে কেমন?

বেশ দ্রুতই চলে।

ভাড়া যাবে?

আমার হাতি গরম হয়েছে। এ-হাতি এখন আমি কাউকেই ভাড়া দেবো না।

ফিলিয়াস ফগ নাছোড়বান্দা। বললেন : আমি ঘণ্টায় দেড়শো টাকা ভাড়া দেবো।

না, আমি ভাড়া চাই না।

মূহুর্তমধ্যে ঘণ্টায় চারশো টাকা ভাড়া উঠলো, কিন্তু মালিক নির্বিকার, বললে : না, সাহেব। আপনারা অন্যত্র চেষ্টা করুন।

পাসপার্তুর মুখ থেকে সব রক্ত যেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো। সার ফ্রান্সিস বুঝলেন, ফিলিয়াস ফগের বিশ্বভ্রমণ এইখানেই খতম হলো!

ফিলিয়াস ফগ কিন্তু তখনও অবিচলিত। বললেন : ভাড়া না-দাও, বিক্রি করো। আমি পনেরো হাজার টাকা দেবো।

মালিক মাথা নাড়তে-নাড়তে ভাবলে, এ সাহেবটা পাগল নাকি?

ব্যাপার দেখে সার ফ্রান্সিস ফগকে আড়াল ডেকে নিয়ে দাম বাড়াতে নিষেধ করলেন। অনেক দাম হয়েছে। এর চেয়ে ঢের-কম দামে এ-দেশে হাতি পাওয়া যায়।

ধীরকণ্ঠে ফগ জবাব দিলেন : উত্তেজিত হয়ে ঝোকের মাথায় আমি কখনও কিছু করি না। ঠিক সময়ে এলাহাবাদ তো যেতেই হবে, তার উপরেই তিন লাখ টাকার বাজি নির্ভর করছে। যে করেই হোক, হাতিটা চাই-ই চাই। পরক্ষণেই মালিকের কাছে এসে বললেন : পনেরো হাজারে হবে না? আচ্ছা, আঠারো হাজার? বিশ হাজার? পঁচিশ হাজার? তাও না! আচ্ছা, তিরিশ হাজারই সই। তিরিশ হাজার দেবো।

তিরিশ হাজার! পাসপার্তুর পাংশু মুখ আরো-পাণ্ডুর হয়ে গেলো। সার ফ্রান্সিস হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। হাতির মালিক দেখলো, আর বেশি আশা করা ভালো নয় কী জানি, যদি এই পাগলা সাহেবের মন ঘুরে যায়! সে হাতিটা ঐ তিরিশ হাজারে বিক্রি করতেই রাজি হলো।

তক্ষুনি একজন মাহুত জোগাড় করে ফিলিয়াস ফগ পাসপার্তু আর সার ফ্রান্সিসকে সঙ্গে নিয়ে এলাহাবাদের দিকে যাত্রা করলেন।

পার্শি মাহুতটির অবশ্য পথ-ঘাট ভালোই জানা ছিলো। বিশ মাইল পথ সংক্ষেপ করবার জন্যে সে বনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলো।

ফিলিয়াস ফগ আর সার ফ্রান্সিস দুজনে দুটি ছোটো হাওদায় বসলেন। পাসপার্তু দুই হাওদার মাঝখানে আশ্রয় নিলে। ঘণ্টা-দুই চলবার পর যখন সকলে জিরিয়ে নেবার জন্যে হাতির পিঠ থেকে নামলেন, তখন সকলেই খুব শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন-হাওদায় বসে

গজেন্দ্রগমনের দুলকিচালে দুলতে-দুলতে সকলেরই সারা শরীর ব্যথায় জর্জর হয়ে উঠেছে। কিন্তু ফগের সেদিকে খেয়ালও ছিলো না। সার ফ্রান্সিস অবাক হয়ে বললেন : মিস্টার ফগ যেন লোহায় গড়া! সেইসঙ্গে পাসপার্তু অমনি এ-কথাও যোগ করে দিলে : কাঁচা লোহায় নয়, পাকা লোহায়।

সামান্য কিছু আহার করে মাহুতের নির্দেশমতো সকলেই আবার হাতির পিঠে উঠলেন। মাহুতের ইঙ্গিতে বিশালদেহী কিউনি হেলে-দুলে বনভূমি পেরিয়ে তালখেজুরের বনের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। জায়গাটার নাম বুন্দেলখণ্ড। দেশীয় রাজাই ছিলেন বুন্দেলখণ্ডের সর্বময় কর্তা। একদল গোঁড়া ধর্মান্ধ উন্মত্ত হিন্দু বাস করতো সেখানে। আরোহীসমেত দ্রুতগামী হাতি দেখে কোথাও-কোথাও কতগুলো লোক কুটিল ক্রোধে এমন হাবভাব দেখালে যে বোঝা গেলো সুযোগ পেলেই তারা কোনো বিপদ ঘটাতে দ্বিধা করবে না। বলা বাহুল্য, এরাই বুন্দেলখণ্ডের সুবিখ্যাত দস্যুদল।

পাসপার্তু তখন ভাবছিলো : এলাহাবাদে পৌঁছে মিস্টার ফগ হাতিটার কী ব্যবস্থা করবেন? কিউনি কি তার সঙ্গেই যাবে? উঁহু, সে-তো সম্ভব নয়। ঢের খরচ পড়বে তবে। বোধহয় বিক্রি করে দেবেন হাতিটা। কিন্তু কিনবে কে হঠাৎ? কিউনির যে-রকম পরিশ্রম হচ্ছে, তাতে মনে হয় ছেড়েই দেবেন একে। আর যদি আমাকেই বখশিশ করে বসেন তাহলেই হবে সবচেয়ে মুশকিলের ব্যাপার!

তখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। বিন্ধ্যপর্বতের কতগুলো দরারোহ উৎরাই পেরিয়ে হাতি একটা ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। ফিলিয়াস ফগ হিশেব করে দেখলেন, এতক্ষণে মাত্র অর্ধেক পথ এসেছেন। রাত তখন অন্ধকার-ছাওয়া। একটু ঠাণ্ডাও

পড়েছিলো। পার্শি মাহুত যে-আগুনের কুণ্ড জ্বাললো, তারই চারদিকে বসে সবাই খাওয়া-দাওয়া শেষ করলেন।

পাসপার্তু ছাড়া সকলেরই বেশ ভালো ঘুম হয়েছিলো। সারাদিন হাতির পিঠে দুলেদুলে পথ চলতে হয়েছিলো বলে সে রাত্রেও ঘুমের ঘোরে তা-ই করতে লাগলো ভালো করে ঘুমই এলো না তার। সার ফ্রান্সিসের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ছিলো। তাই স্থানে-অস্থানে ঘুমুনোর অভ্যেসও ছিলো। আর নির্বিকার-চিত্ত ফিলিয়াস ফগ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুলেন—যেন তার সেভিল রো-র বাসার দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শুয়েছেন।

সকাল ছ-টার সময় তারা আবার হাতির পিঠে উঠে বসলেন। মাহুত জানালে যে, সন্ধের আগেই এলাহাবাদ পৌঁছুনো যাবে। সে লোকালয় ছেড়ে ছায়াঘেরা বনপথেরই আশ্রয় নিয়েছিলো। অনেকক্ষণ চলবার পর হঠাৎ হাতিটি থমকে দাঁড়ালো।

এ-কী! এখন মাত্র বিকেল চারটে–এখনই কিউনি থামলো কেন? সার ফ্রান্সিস মাহুতকে শুধোলেন : থামলে যে? কী হলো হঠাৎ?

পার্শি মাহুতটি বললে : কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। কী যেন একটা এদিকপানেই আসছে।

সবাই কান পেতে শুনলেন, দূর থেকে একটা বাজনার শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ধীরে-ধীরে সে-শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। মাহুত কিউনিকে একটা গাছে বেঁধে রেখে কী ব্যাপার দেখবার জন্যে একটু এগিয়ে গেলো।

একটু বাদেই ফিরে এলো সে। দ্রুতকণ্ঠে বললে : বুন্দেলখণ্ডের ব্রাহ্মণদের একটা শোভাযাত্রা আসছে। চলুন, আমরা পালিয়ে যাই।

হাতি নিয়ে বনের গভীরে ঢুকলো মাহুত।

ঢাক-ঢোলের আওয়াজ আর চাচামেচি-ভরা একটা তুমুল কোলাহল ক্রমেই এগিয়ে। আসতে লাগলো। দেখতে-দেখতে শোভাযাত্রা দৃষ্টিপথে এসে হাজির হলো। উষ্ণীষ আর আলখাল্লা-পরা পুরোহিতরা চলেছে শোভাযাত্রার আগে-আগে। নানা-বয়সি লোকজন সমবেতস্বরে এক করুণ শ্মশান-সংগীত গাইতে-গাইতে পুরোহিতদের ঘিরে চলেছে। ঢাক-ঢোলের আওয়াজের নিচে মাঝে-মাঝে সেই গানের শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছিলো।

এদের পিছনেই একটা রথ টেনে নিয়ে চলেছে কয়েকটা ঘোড়া। রথের উপর এক দেবীমূর্তি। ভয়ংকর তাঁর রূপ। মূর্তিটি দেখেই সার ফ্রান্সিস চিনতে পারলেন। বললেন, এই-ই হিন্দুদের করালবদনা ভয়ালভীষণা কালী-মূর্তি। তাদের প্রেম আর মুক্তির প্রতিভূ।

পাসপার্তু বলে উঠলো : উঃ, কী ভীষণ রূপ এঁর! এ-যে দেখছি মৃত্যুর প্রলয়ংকরী মূর্তি, প্রেমের স্নিগ্ধ আভার প্রতিমা মোটেই নয়! আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু মাহুতের ইঙ্গিতে তাকে চুপ করে যেতে হলো।

কালী-মূর্তিটিকে ঘিরে জন-কতক পুরোহিত উম্মাদের মতো দাপাদাপি করে নাচছিলো। এদের পরই দেখা গেলো দামি-পোশাক-পরা একদল ব্রাহ্মণকে। এরা এক ভদ্রমহিলাকে সবলে টেনে আনছিলো। ভদ্রমহিলা প্রতি-পদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলেন।

ভদ্রমহিলা অপূর্ব সুন্দরী। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর। সারা গায়ে বহুমূল্য অলংকার। পরনে স্বর্ণখচিত মখমলের পোশাক, তার উপর মশলিনের একটা ওড়না। তার ভিতর দিয়ে তার সুকুমার দেহ-লাবণ্য ও অতুলনীয় দেহগঠন ফুটে বেরুচ্ছিলো।

মহিলাটির চারধারে খোলা তলোয়ার হাতে বন্দুক কাঁধে একদল প্রহরী। এদের পিছনে একদল লোক একটি শবাধার বয়ে আনছিলো। শবটি একজন বৃদ্ধের। বহুমূল্য রাজপোশাকে ঢাকা। মুক্তো-খচিত উষ্ণীষ, সোনা আর রেশমের তৈরি দেহাবরণ, কটিবন্ধে কিংখাবের উপর হীরক বসানো। মৃতদেহের পাশে বহুমূল্য অস্ত্র-শস্ত্র পড়ে। সব পেছনে কতগুলো লোক উম্মাদের মতো বিকট চীৎকার করতে-করতে এগুচ্ছিলো। তাদের চীৎকারের নিচে গান-বাজনার আওয়াজ চাপা পড়ে গিয়েছিলো।

সার ফ্রান্সিস মাহুতের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন : এই বুঝি সতী?

মাহুত ঠোটে আঙুল দিয়ে সকলকে নীরব থাকতে ইঙ্গিত করলো। শোভাযাত্রা কিছুক্ষণ বাদে অরণ্যের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেলে পর ফিলিয়াস ফগ শুধোলেন : সতী কী?

সার ফ্রান্সিস জবার দিলেন : এ একধরনের নরবলি! তবে তফাৎ এই যে, যে নিহত হয়, সে স্বেচ্ছায় প্রাণ দেয়। এখুনি যে ভদ্রমহিলাকে দেখলেন, কাল ভোরে তার দেহ আগুনে পুড়বে।

পাসপার্তু উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কী সর্বনাশ! এরা কি রাক্ষস নাকি?

ফিলিয়াস ফগ প্রশ্ন করলেন : ঐ মৃতদেহটি কার?

মাহুত বললে : ঐ ভদ্রমহিলার বৃদ্ধ স্বামীর। তিনি এ-অঞ্চলের একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন।

এখনও এই সর্বনেশে প্রথা চালু আছে?

ভারতের বেশির ভাগ জায়গাতেই এ-প্রথা এখন আর চলতি নেই। সার ফ্রান্সিস বললেন : তবে বুন্দেলখণ্ডে এখনও এই প্রথা প্রচলিত-স্বাধীন রাজ্য কি-না, তাই ইংরেজের আইন চালু হয়নি। এভাবে জীবন্ত পুড়ে মরতে রাজি না-হলে তার কপালে আজীবন যে কত দুঃখ আছে, তার ইয়ত্তা নেই। সমাজ তার মাথা মুড়িয়ে দেবে, একঘরে করবে, তার ছায়া পর্যন্ত মাড়াবে না। কিছুদিন আগে আমি যখন বম্বাই ছিলুম, তখন একবার একটি বিধবা তার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার জন্যে গবর্নরের অনুমতি চেয়েছিলো। গবর্নর সে-অনুমতি না-দেয়ায় বিধবাটি খুব ক্ষুব্ধ হয়ে বম্বাই ছেড়ে চলে গেলো অন্যখানে। সেখানে একজন রাজার সাহায্যে শেষে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরলো।

মাহুত ঘাড় নেড়ে এ-কথা স্বীকার করে বললে : কাল যে সতীদাহ হবে, তা কিন্তু স্বেচ্ছায় হবে না!

তুমি কী করে জানলে? ফিলিয়াস ফগ শুধোলেন।

বুন্দেলখণ্ডে এ-কথা কে না জানে?

কিন্তু কই, ভদ্রমহিলাকে তো কোনো বাধা দিতে দেখলুম না?

কী করে বাধা দেবেন? আফিং আর ধোঁয়ায় তার কি আর এখন জ্ঞান আছে?

তাঁকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

পিল্লাজির মন্দিরে। এখান থেকে সে-মন্দির দু-মাইল দূরে। আজ রাত্রে সবাই সেখানে থাকবে। কাল খুব ভোরে সতী হবে। এই বলে মাহুত যেই হাতিটা চালাতে যাবে, অমনি ফিলিয়াস ফগ বাধা দিলেন। রাখো, রাখো। সার ফ্রান্সিস, আমরা যদি ভদ্রমহিলাকে রক্ষা করি?

রক্ষা করবেন? সার ফ্রান্সিস অবাক হলেন।

এখনও আমার হাতে বারো ঘণ্টা সময় আছে। ফিলিয়াস ফগ বললেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সার ফ্রান্সিস। এতক্ষণে বুঝলুম, আপনার হৃদয় আছে! আর সে-হৃদয় সাড়া দেয় ঠিক মোক্ষম জায়গায়, একেবারে আসল ব্যাপারে!

ফগ বললেন: হ্যাঁ, তা কখনো-কখনো সাড়া দেয় বৈকি।

৫. দুঃসাহসের ডাকে

ব্যাপারটি যেমন গুরুতর, তেমনি দুঃসাহসিক। অসম্ভব বললেও চলে। অগ্রপশ্চাৎ নাভেবে দুঃসাহসের ডাকে এভাবে সাড়া না-দিলেই ভালো করতেন ফগ। এ-কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে কে জানে বিপক্ষের হাতে তাকে মরতে হবে কি-না! অন্তত চিরকালের জন্যে বন্দী হবেন কি না, তা-ই বা কে জানে? তাহলেই তো সব খতম হয়ে গেলো। যেজন্যে এত পরিশ্রম করে তিনি এতদূর এসেছেন, তা ব্যর্থ হবে। আশিদিনে সারা পৃথিবী ঘুরে আসবার জন্যে যে-বাজি ধরেছেন, তাহলে সেই বাজিতে হারতে হবে তাকে। কিন্তু তার হৃদয় কোনো বাধাই মানলো না। তিনি দেখলেন, এ-কাজে সার ফ্রান্সিস একজন শক্তিশালী সহযোগী। পাসপার্তুও যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। ভাবনা একটাই, সেটি এই পার্শি মাহুতের জন্যে।

সে যদি সাহায্য না-করে, না-করলো—কিন্তু দেখতে হবে সে যাতে বিপক্ষের দলে না-যায়।

সার ফ্রান্সিস তাই সোজাসুজি মাহুতকে সে-কথা জিগেস করলেন। মাহুত জবাব দিলে, আমি পার্শি। আপনারা যাঁকে উদ্ধার করতে চাচ্ছেন, তিনিও পার্শি। আপনারা যা বলবেন, আমি তা-ই করবো। সে আরো বললে : আপনারা মনে রাখবেন, আমাদের সামনে মস্ত-একটা বিপদ পাহাড়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। এ-কাজে শুধু-যে আমাদের জীবনের আশঙ্কা আছে, তা-ই নয়—যদি আমরা ধরা পড়ি, তবে মৃত্যুর আগে যন্ত্রণারও কমতি হবে না।

ফিলিয়াস ফগ জবাব দিলেন : সে-সব বিপদ ঘাড়ে নিতে আমরা তৈরি আছি। সন্ধে অব্দি অপেক্ষা করা যাক, রাতের অন্ধকারে কাজ শুরু করা যাবে। ভদ্রমহিলাটি কে, তুমি জানো?

মাহুত বললে, ভদ্রমহিলার নাম আউদা। বম্বাইয়ের একজন ধনী বণিকের মেয়ে। তিনি উচ্চশিক্ষিতা। দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়েছেন। মা-বাবা কেউ নেই। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বুড়ো রাজার সঙ্গে আজ তিন মাস হলো তার বিয়ে হয়েছে। ভয়ানক দুরদৃষ্টের কথা ভেবে তিনি পালিয়ে যাবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। রাজার কয়েকজন নিকটআত্মীয় আছেন। তারা রাজসম্পত্তির ভোগদখল চান। আউদা বেঁচে থাকলে তাদের সুবিধে হবে না বলে তারা জোর করে তাকে পুড়িয়ে মারছেন।

মাহুতের কথা শুনে ফিলিয়াস ফগের সংকল্প আরো-দৃঢ় হলো। মাহুতকে বললেন : কোনো সাড়াশব্দ না-করে পিল্লাজির মন্দিরের যত কাছে পারো, তত কাছে নিয়ে চলো।

কিউনি আধঘণ্টার মধ্যেই তাদের নিয়ে মন্দিরের প্রায় আধমাইল দূরে এসে দাঁড়ালে। গাছপালার আড়াল থেকে তখন সেই তুমুল শোরগোল শোনা যেতে লাগলো।

মাহুত বললে : রানী আউদা নিশ্চয়ই এখন মন্দিরের মধ্যে বন্দিনী।

সকলেই ভাবতে লাগলেন, কী করে তাকে উদ্ধার করা যায়। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, তখন কি মন্দিরে প্রবেশ করা ঠিক হবে, না দেয়াল ভেঙে সেই ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকলে সুবিধে হবে? মন্দিরের কাছে গিয়ে সরেজমিন তদন্ত করে না দেখলে এ-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না।

তারা উদগ্রীব হয়ে রাত্রির প্রতীক্ষ করতে লাগলেন। সন্ধে ছ-টার সময় বন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেলো। প্রহরীদের অতিক্রম করে মন্দিরের কাছে যাওয়ার সেটাই একমাত্র সুসময় দেখে মাহুত তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। তারা ধীরে-ধীরে খুব সাবধানে বনপথে হামাগুড়ি দিয়ে এগুলেন। একটু যাওয়ার পরই ছোট্ট একটা ঝর্নার কাছে এসে পৌঁছুলেন তারা। মশালের আলোয় দেখলেন, রাশি-রাশি চন্দনকাঠ দিয়ে একটা মস্ত চিতা তৈরি হয়েছে। সেই চিতায় শোয়ানো হয়েছে বুড়ো রাজার মৃতদেহ। রানী আউদার সঙ্গে পরদিন ভোরবেলাতেই তা ভস্মসাৎ হবে। চিতা থেকে মন্দিরটি একশো হাতেরও বেশিদূর হবে না। মন্দিরের গম্বুজটা সন্ধের অন্ধকারে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিলো।

মাহুতের ইঙ্গিত-মতো বড়ো-বড়ো ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে-লুকিয়ে তারা আরো

সাবধানে রুদ্ধনিশ্বাসে নিঃশব্দে এগুতে লাগলেন।

খোলা মাঠের কাছে এসে মাহুত থামলো। সিদ্ধি খেয়ে বিভোর হয়ে প্রহরীরা সেখানে শুয়ে ছিলো। দু-একজন তখনও টলতে টলতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। কাছেই গোটা-কয়েক মশাল জ্বলছিলো কম্পিত শিখায়। মশালের ছায়া-আলোয় তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, সবলদেহ রাজপুত প্রহরীরা খোলা তলোয়ার হাতে মন্দিরের সামনে পায়চারি করে পাহারা দিচ্ছে।

মাহুত আর এগুলো না। বুঝলো, বিনা বাধায় এ-পথে এগুনো অসম্ভব! সার ফ্রান্সিস আর ফগেরও সেই একই ধারণা হলো। তারা মৃদুস্বরে পরামর্শ করতে লাগলেন। সার ফ্রান্সিস

বললেন : আরো-খানিকক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। এই-তো সবে আটটা বাজলো। বেশি রাতে প্রহরীরা নেশাভাঙ করে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

তারা তখন একটা গাছের নিচে শুয়ে উত্তেজিতভাবে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। সময় যেন আর কাটতেই চায় না। মাহুত মধ্যে-মধ্যে এদিক-ওদিক গিয়ে খবর নিতে লাগলো। দেখলো, প্রহরীরা আগের মতোই পাহারা দিচ্ছে। মশালও আগের মতোই জ্বলছে। মন্দিরের ভিতর থেকেও তখন জানলা দিয়ে কম্পিত আলোকরেখা দেখা যাচ্ছিলো।

রাত গভীর হলো, কিন্তু অবস্থার আদপেই কোনো বদল হলো না। তখনও অতন্দ্রচোখে পাহারা দিচ্ছিলো প্রহরীরা। মনে হলো, তারা যেন সারারাতই এ-ভাবে জেগে কাটিয়ে দেবে। এ-পথ ছেড়ে মন্দিরের দেয়াল ভেঙে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টাই তখন যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো। তাই মাহুত ফের সন্তর্পণে সব দেখে আসতে অগ্রসর হলো। ফগ, পাসপার্তু আর সার ফ্রান্সিস মাহুতকে অনুসরণ করলেন।

অন্ধকার এমনই গাঢ় গভীর-ঘন যে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। দূরের মশালগুলো যেন চারপাশের অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে তুলেছিলো। তারা ভাবলেন, আর-কিছু চাই না, কোনোরকমে একবার মন্দিরের দেয়ালের সন্ধান পেলেই হলো। প্রবেশের পথ থাকলে তো ভালোই-না-থাকলে পথ বের করে নিতে হবে।

একটু বাদেই মন্দিরের ইটের দেয়াল গায়ে ঠেকলো। সেদিকে কোনো দরজা বা জানলা ছিলো না। ফগ আর সার ফ্রান্সিস অন্য-কোনো সরঞ্জাম না-থাকায় পকেট ছুরির সাহায্যে

ইট খুলতে লাগলেন। মাহুত আর পাসপার্তু সেই আলগা ইটগুলো ধীরে-ধীরে খুলে নিতে লাগলো।

খান-কয়েক ইট খোলবার সঙ্গে-সঙ্গেই মন্দিরের ভিতর হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো! সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে কোলাহল উঠলো। পাসপার্তু আর মাহুত থামলো। সেখানে আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না মনে করে সার ফ্রান্সিস সকলকে নিয়ে চট করে দূরে সরে গেলেন। ভাবলেন, পরে সুযোগ পেলে আবার আসবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না। খোলা তলোয়ার হাতে প্রহরীরা তক্ষুনি মন্দিরটি ঘিরে দাঁড়ালে।

রাগে সার ফ্রান্সিস ফুলতে লাগলেন। পাসপার্তু খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। অনেক চেষ্টায় আত্মসংবরণ করলো মাহুত। শুধু ফিলিয়াস ফগ তখনও অবিচলিত ও অকম্পিত রইলেন।

সার ফ্রান্সিস বললেন : আর কেন? চলুন, এবার ফিরে যাওয়া যাক।

ধীরকণ্ঠে ফগ জবাব দিলেন : অত তাড়া কীসের? আমি যদি কাল দুপুরবেলা এলাহাবাদ পৌঁছুতে পারি, তাহলেই হবে। দেখাই যাক না শেষপর্যন্ত। শেষমুহূর্তেও তো আমাদের কোনো-একটা সুযোগ ঘটতে পারে।

সার ফ্রান্সিস ফিলিয়াস ফগের এই অবিচলিত ধৈর্য দেখে বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, শেষমুহূর্তে তার আর কী-সুযোগ ঘটবে? ইনি কি তবে জ্বলন্ত চিতায় লাফিয়ে পড়ে রানী আউদাকে উদ্ধার করবেন? এ-বকম উন্মাদ প্রয়াস যে বিফল ও বিপজ্জনক হবে, সে তো সকলেই জানে। ফিলিয়াস ফগের মতো ধীর-স্থির-স্থিতধী ইংরেজ যে অবোধের মতো

এমন-একটা কাজ করবেন, এ-কথা সার ফ্রান্সিসের মোটেই বিশ্বাস হলো না। তবু এই ভয়ানক দৃশ্যের যবনিকাপাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হলেন তিনি। মাহুত আবার পথ দেখিয়ে তাদের বনের বাইরে মাঠের কিনারে নিয়ে গেলো। তারা সেখানেই লুকিয়ে থেকে, দূর থেকে, সেই নৃশংস হত্যার আয়োজন দেখতে লাগলেন। সতী মানেই জীবন্ত নারীদেহে অগ্নি-সংযোগ।

পাসপার্তু মনে-মনে একটা মৎলব করে নিয়েছিলো। সকলের অলক্ষ্যে সে কোথায় চলে গেছে, কেউ তা জানতেও পারলেন না। অন্ধকারে পাসপার্তু গাছের তলা দিয়ে খুবই সাবধানে সেই চিতা-শয্যার দিকে এগুতে লাগলো। সে-যে কোথায় যাচ্ছে, তা শুধু সেই জানে!

আস্তে-আস্তে ভোর হয়ে এলো। প্রসন্ন প্রভাতের সোনালি আলো আকাশের কোলে মৃদু হাসির মতো ফুটে উঠলো; কিন্তু মন্দিরের চারদিকে তখনও ঘন অন্ধকার ছেয়ে আছে। এই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণই সতীদাহের সময় বলে ঠিক করা হয়েছিলো। আস্তে-আস্তে সবাই ঘুম থেকে উঠলো। তাদের চঁচামেচিতে আর ঢাক-ঢোলের প্রচণ্ড আওয়াজে বন-প্রান্তর কেঁপে উঠলো। ক্রমশ সতীদাহের সময় এসে উপস্থিত হলো।

হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেলো মন্দিরের দরজা খোলা দরজা দিয়ে মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো সুতীব্র আলোর ঝলক। দেখা গেলে, দুজন পুরোহিত দু-দিক থেকে ধরে সেই মৃত্যুপথযাত্রিণীকে মন্দিরের বাইরে টেনে আনলে। বার-কয় পলায়নের চেষ্টা করে আফিঙের ধোঁয়ায় আবার নেতিয়ে পড়েছিলেন ভদ্রমহিলা। পুরোহিতেরা রানী আউদাকে

নিয়ে চিতার দিকে এগুলো। প্রভাতের অর্ধস্ফুট আলোয় সেই ভয়ানক গায়েকাঁটা-দেয়া দৃশ্য অপলক চোখে দেখতে লাগলেন ফিলিয়াস ফগ।

চিতার উপর বুড়ো রাজার মৃতদেহ পড়ে। রনী আউদাকে তার মৃত স্বামীর পাশে শুইয়ে রাখা হলো। স্তুপীকৃত চন্দন কাঠে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো—অমনি ধোঁয়ায়ধোঁয়ায় ভরে উঠলো চারদিক। তুমুল শব্দে বেজে উঠলো বাজনা-ঢাকঢোল জগঝম্প।

ছুরি হাতে ফগ সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগুবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সার ফ্রান্সিস আর মাহুত অনেক কষ্টে তাকে ধরে আটকালেন। ফিলিয়াস ফগ তাদের ধাক্কা দিয়ে ফের তার পা বাড়াবেন, এমন সময় এক অভাব্য অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে হতচকিত হয়ে পড়লেন; স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, পাথরের মতো।

সতীদাহ করতে যারা এসেছিলো তারা ভীতস্বরে উঠলো চেঁচিয়ে। আশঙ্কায় উদ্বেগে বিস্ময়ে-বিস্ফারিত চোখে তারা তাকিয়ে দেখলো, বৃদ্ধ রাজা নবজীবন লাভ করেছেন। রানী আউদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাজা। তারা ভয়ে তাদের পুনরুজ্জীবিত রাজার দিকে আর তাকাতে পারলে না, প্রণত হয়ে মাটিতে মাথা ছোঁয়ালে।

চক্ষের পলকে জ্বলন্ত চিতা ছেড়ে রাজার প্রেতাত্মা ফিলিয়াস ফগের কাছে এসে বললো : আর দেরি নয়; চলুন, চলুন শিগগির! জলদি!

সবিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে দেখলেন, অচৈতন্য আউদাকে কাঁধে নিয়ে পাসপার্তু দাঁড়িয়ে! ধোঁয়ায় যখন চারদিক ভরে গিয়েছিলো তখন সেই ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে পাকার কাঠের উপর উঠে সে রক্ষা করেছে মৃত্যুপথযাত্রিণীকে!

আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট করলেন না তারা। তক্ষুনি ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করলেন বনের গহনে। দ্রুতগামী কিউনি তাদের নিয়ে এলাহাবাদের দিকে ছুটলো।

নিস্তব্ধ অরণ্য খানিকক্ষণের মধ্যেই কোলাহলে কলরবে চঞ্চল ও চকিত হয়ে উঠলো। বন্দুকের আওয়াজে চারদিক কেঁপে উঠলো। হাতির পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ করে গুলি ছুটে যেতে লাগলো। সতীদাহ করতে যারা এসেছিলো, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পাগলের মতো পিছু-পিছু ছুটে এলো বটে, কিন্তু বনের সেই গভীর-গহনে হাতি কিংবা তার সোয়ারদের আর নাগাল পেলে না।

এই দুঃসাহসিক প্রয়াস সফল হয়ে যাওয়ায় হাতির পিঠে বসে হাসছিলো পাসপার্তু। সার ফ্রান্সিস তো খুশি হয়ে তার সঙ্গে বার-কয় হ্যাণ্ডশেক করে ফেললেন, আর ফিলিয়াস ফগ শুধু বললেন : বেশ করেছে। তার মতো গম্ভীর-মেজাজ লোকের কাছ থেকে এই ছোট্ট প্রশংসাটুকুই যথেষ্ট। পাসপার্তু তার প্রশংসার জবাবে বললো : এ-কাজের যা-কিছু গৌরব, যা-কিছু প্রশংসা—সবই তো আপনার প্রাপ্য—আমি শুধু উপলক্ষ মাত্র।

মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেলেও আউদার জ্ঞান তখনও ফেরেনি। তার দিকে তাকিয়ে সার ফ্রান্সিস বললেন : এঁর বিপদের এখানেই শেষ নয়। যদ্দিন ইনি ভারতবর্ষে থাকবেন, তদ্দিন এর জীবন নিরাপদ নয়। ভারতবর্ষের যেখানেই থাকুন না কেন, এঁর ক্রুদ্ধ শত্রুরা

এর সন্ধান করবেই, আর সুযোগ পেলেই পুড়িয়ে মারতে ছাড়বে না। ইংরেজের আইন ইংরেজের পুলিশ কিছুতেই একে রক্ষা করতে পারবে না। দিন-কয়েক আগেই এমনি-একটা ঘটনা ঘটে গেছে। ইনি যদি একবার ভারতবর্ষের বাইরে অন্যকোনো দেশে যেতে পারেন, তবেই নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।

ফিলিয়াস ফগ বললেন : এ-কথার জবাব এত চটপট দেয়া যাবে না, ভেবে দেখতে হবে।

বেলা দশটার সময় তারা এলাহাবাদে এসে পৌঁছুলেন। আউদার তখন ক্রমশ জ্ঞান ফিরে আসছিলো—ধীরে-ধীরে তিনি চোখ খুললেন। তাঁকে ওয়েটিং-রুমে রেখে ফগ তার জন্যে কতগুলো দরকারি জিনিশপত্র কিনতে পাসপার্তুকে বাজারে পাঠালেন।

এলাহাবাদ থেকে ট্রেন ছাড়বার সময় হলো। ফিলিয়াস ফগ সেই পার্শি মাহুতকে তার পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে বললেন : তুমি আমাদের জন্য যথেষ্ট করেছে। সেজন্যে হাতিটা দিতে চাই তোমায়। নেবে তো?

মাহুতের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ট্রেনে উঠতে উঠতে ফগ বললেন : হাতিটা নিয়ে যাও। কিন্তু এতেও আমি তোমার ঋণ শোধ করতে পারলুম না।

ট্রেন ছেড়ে দিলে। আউদার তখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এসেছে। সব শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন সবাইকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁকে ব্যাকুল করে তুললো।

তার মনোভাব বুঝতে পেরে ফগ বললেন : আপনার ভয় নেই। আমি হংকং যাচ্ছি। বাধা না-থাকলে আপনাকেও সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভিভূত আউদা বললেন : হংকং-এ আমার এক ধনী আত্মীয় ব্যাবসা করতেন। বোধহয় এখনও তিনি সেখানেই আছেন।

তাহলে তো খুব ভালো হলো। ফগ বললেন। আমরা তাহলে তাকে খুঁজে বার করবো।

৬. বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে অতর্কিতে

পঁচিশে অক্টোবর ভোরবেলা ফিলিয়াস ফগ কলকাতা পৌঁছুলেন। বেলা একটার সময় হংকং-এর জাহাজ ছাড়বে, সুতরাং তখনও ঘণ্টা-কয়েক সময় হাতে ছিলো। ডায়রি খুলে ফগ দেখলেন ছাব্বিশে অক্টোবর তার কলকাতা পৌঁছুবার কথা। আজ তেইশ দিন হলো তিনি লণ্ডন ছেড়েছেন। জাহাজ তাড়াতাড়ি আসায় হাতে যে-দু-দিন সময় প্রায় ফাউ পাওয়া গিয়েছিলো, আউদাকে উদ্ধার করতে গিয়েই তা কেটে গেছে। সময়ের হিশেব করে ফগ বুঝলেন যে, যে-করেই হোক বেলা একটার জাহাজেই তাকে হংকং যাত্রা করতে হবে।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থামতে-না-থামতেই পাসপার্তু গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। তার ইচ্ছে ছিলো আগেভাগেই হংকং-এর জাহাজে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করে রাখবে।

এমন সময় ধরাচুড়ো পরা একজন ইংরেজ দারোগা এসে শুধোলে : আপনার নামই কি ফিলিয়াস ফগ?

ঘাড় নেড়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দারোগার দিকে তাকাতেই দারোগা ফগকে জিগেস করলেন : এই বুঝি আপনার ফরাশি ভৃত্য?

হ্যাঁ।

আপনারা কি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে একটু আসবেন?

ফিলিয়াস ফগ একটুও বিচলিত হলেন না। ইংরেজের চোখে আইন অতি পবিত্র জিনিশ, আর পুলিশ দেশের আইন-রক্ষক। কিন্তু পাসপার্তু তর্ক করতে উদ্যত হলো। ফিলিয়াস ফগ তাকে থামিয়ে দিয়ে শুধোলেন : এই ভদ্রমহিলা কি আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন?

অনায়াসে। জবাব দিলেন দারোগা।

তারা তখন একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসলেন। সাহেব-পাড়ার একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো। দারোগা তার বন্দীদের নিয়ে একটা ঘরে ঢুকলেন। সেখানে তাদের বসতে বলে জানালেন যে : ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াদিয়ার কাছে সাড়ে-এগারোটার সময় আপনাদের বিচার হবে। এই বলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দারোগা প্রস্থান করলেন।

আউদার চোখে জল এসে গেলো। আমার জন্যেই আপনাদের এই বিপদ। আমাকে রক্ষ করতে গিয়েই আপনারা বন্দী হলেন।

ফিলিয়াস ফগ শান্তগলায় তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। ইংরেজ রাজত্বে সতীদাহ নিবারণ করলে কোনো অপরাধ হয় না। বোধহয় পুলিশ ভুল করে কোনো-একজনকে ধরতে গিয়ে আমাদেরই ধরেছে। সে যা-ই হোক, নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। যে-করেই হোক আপনাকে হংকং-এ নিয়ে যাবোই।

ফগের কথা শুনে পাসপার্তু বললে : জাহাজ যে বেলা একটার সময় ছাড়বে!

তার আগেই আমরা জাহাজে পৌঁছে যাবো।

ফগের দৃঢ় কণ্ঠস্বর কিন্তু পাসপার্তুর আশঙ্কা দূর করতে পারলো না।

সাড়ে-এগারোটার সময় দারোগা এসে তাদের আদালতে বিচারস্থানে নিয়ে গেলেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াদিয়া এসে চেয়ারে বসতেই আবদালি হাঁকলো : আসামী ফিলিয়াস ফগ হাজির?

হাজির।

পাসপার্তু?

হ্যাঁ, হাজির।

ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট তখন বললেন : বাদীদের ডাকো।

সঙ্গে-সঙ্গে একজন আরদালি তিনজন পুরোহিতকে সামনে এনে হাজির করলে। এরা তিনজনেই বম্বাইয়ের লোক। পাসপার্তু বিড়বিড় করে আপন মনে বললে : এ–যে দেখছি শেষে তা-ই! এরাই তো আউদাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলো!

অপরাধের বিবরণ পড়ে শোনানো হলো আসামীদের। হিন্দুদের কাছে অতীব পবিত্র একটি মন্দিরকে অপবিত্র করবার জন্যে ফিলিয়াস ফগ ও তার ভৃত্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে।

ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ফিলিয়াস ফগের দিকে তাকালেন। অভিযোগ সম্পর্কে আসামীর কী বলবার আছে?

নিজের পকেট-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ফগ বললেন : হ্যাঁ, আমি অপরাধ স্বীকার করছি।

আপনি অপরাধ স্বীকার করছেন?

হ্যাঁ, কিন্তু পিল্লাজির মন্দিরে পুরোহিতেরা যে-পৈশাচিক কাণ্ড করেছেন, সেসম্পর্কে তারা কী বলতে চান, কী কৈফিয়ৎ দিতে চান, সে-কথা জানবার জন্যেই ব্যগ্র। হয়ে আছি।

পুরোহিতেরা মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করলে। ফিলিয়াস ফগ ঠিক কোন কথার উল্লেখ করছেন, তা তারা বুঝতে পারেনি।

পাসপার্তু বললে : হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। পিল্লাজির মন্দিরের কথাই জানতে চাই। সেখানে এঁরা একজন নিরীহ নির্বিরোধী নির্দোষী মহিলাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করছিলেন।

কথা শুনে তো পুরোহিতেরা একেবারে থ! তারা এত হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো যে গোড়ায় কোনো কথাই বলতে পারেনি। ওয়াদিয়া অবাক হয়ে শুধোলেন : তার মানে? কাকে পুড়িয়ে মারবার আয়োজন হয়েছিলো? সে কোথায়? বম্বাই-এ নাকি?

পাসপার্তু বললে : হ্যাঁ, বম্বাই-এ।

আমরা পিল্লাজির মন্দিরের কথা বলছিনে, মালাবারের মন্দিরের কথা বলছি। পেশকার জানালে। অপরাধের প্রমাণ হিশেবে, সেই মন্দির-অপবিত্রকারীর জুতো এখানে আনা হয়েছে।

জুতো দেখেই পাসেপার্তু বলে উঠলো : এ-কী! ও-যে আমার জুতো।

এখানে আগেকার কথা কিছু বলে নেয়া দরকার। বম্বাইয়ের রেলস্টেশনে ধুরন্ধর। গোয়েন্দা ফিক্স যখন দেখেছিলেন ব্যাংক-দস্য পালিয়ে যাচ্ছে, তখন মালাবারের পুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে, তাদের প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে, মন্দির। অপবিত্র করবার জন্যে মোকদ্দমা দায়ের করতে রাজি করিয়েছিলেন। পুরোহিতদের মধ্যে কেউ-কেউ পরের ট্রেনেই ফগকে অনুসরণ করেছিলো।

কলকাতায় এসে ফিক্স দেখলেন, ফগ তখনও কলকাতায় পৌঁছোননি। তখনই তিনি আন্দাজ করলেন, ব্যাংক-দস্যু পলিশকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে পথে কোথাও নেমেছে, দু-এক দিনের মধ্যেই নিশ্চয়ই চুপি-চুপি এসে পড়বে। ফিক্স হাওড়া স্টেশনেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। পঁচিশে অক্টোবর ভোরবেলা পাসপার্তু যখন ট্রেন থেকে নামলে, অমনি তার ইঙ্গিতে কলকাতার দারোগা তাদের গ্রেপ্তার করলেন। পাসপার্তু যদি মুহূর্তের জন্যেও আদালতের চারদিকে তাকিয়ে দেখতো, তবে দেখতে পেতো, সেই ঘরের এককোণে বসে ফিক্স বিপুল আগ্রহে এই মামলার শুনানি লক্ষ করছেন। তখনও ব্যাংক-দস্যুকে গ্রেপ্তার করবার আশা ফিক্স ছাড়েননি। বিলেতের ওয়ারেন্ট কলকাতায় পাবার আশা তখনও তার ছিলো।

ওয়াদিয়ার প্রশ্নের জবাবে অপরাধ স্বীকার করলে ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিলেন : ইংরেজ গবর্মেন্ট ভারতবর্ষের সকল ধর্মই রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেউ কোনো ধর্মের কোনো অবমাননা করলে তাকে কঠোর সাজা দিতে কসুর করেন না। পাসপার্তু গত বিশে অক্টোবর বম্বাইয়ের অন্তর্গত মালাবারের মন্দিরে প্রবেশ করে মন্দির অপবিত্র

করেছে। সে এই অপরাধ স্বীকারও করেছে। বিচার পনেরো দিনের জন্যে মুলতুবি রইলো। ততদিন হাজত।

পাসপার্তু বিহ্বল হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো : পনেরোদিন হাজতবাস?

আরদালি চীৎকার করে বললে : চুপ, চুপ!

ম্যাজিস্ট্রেট রায় পাঠ করতে লাগলেন : যদিও দেখা যাচ্ছে ফিলিয়াস ফগ মন্দির অপবিত্র করার কাজে জড়িয়ে ছিলেন না, তবু পাসপার্তুর পলায়নে সাহায্য করবার জন্যে তার প্রতিও ঐ আদেশ জারি করা হলো।

শুনে ফিক্স আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ফিলিয়াস ফগ তো দু-হপ্তার জন্যে কলকাতায় আটকা পড়লো, এর মধ্যেই নিশ্চয়ই বিলেত থেকে ওয়ারেন্ট এসে পৌঁছুবে। আর পাসপার্তুর তখন নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিলো। তারই নির্বুদ্ধিতায় ফগের সর্বনাশ হতে চললো দেখে নিজের গালে ঠাশ-ঠাশ করে চড় কষাবার ইচ্ছে হচ্ছিলো তার।

কিন্তু ফিলিয়াস ফগ তখনও অবিচলিত রইলেন, যেন কিছুই হয়নি। দৃঢ়স্বরে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন : আমি জামিন চাই।

এখানে আপনাদের কেউ চেনে না। এক-এক জন পনেরো হাজার টাকা দিতে রাজি থাকলে জামিন দেয়া যেতে পারে।

ফিরে বুক দুরুদুরু করে উঠলো। তিনি ভাবলেন, ফগ কি এতই নির্বোধ যে একমুহূর্তে এত টাকা নষ্ট করবে।

ফিলিয়াস ফগ কিন্তু দ্বিরুক্তি না-করে ব্যাগ থেকে একতাড়া নোট বের করে পেশকারের টেবলের উপর রেখে বললেন : টাকাটা আমি এক্ষুনি দাখিল করতে চাই।

ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন : বিচারের দিন হাজির হলেই টাকাটা আপনারা ফেরৎ পাবেন, এখনকার মতো আপনারা জামিনে খালাশ হলেন।

ব্যাপার দেখে ফিক্স বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

মুহ্যমান পাসপার্তুর দিকে তাকিয়ে ফগ বললেন : চলে এসো, পাসপার্তু।

একটা বাজতে তখন মাত্র আধঘণ্টা বাকি। ফিলিয়াস ফগ একটা গাড়িতে উঠে সোজা জাহাজ-ঘাটের দিকে ছুটলেন।

বিমূঢ়ভাব অপসৃত হতেই ফিক্স ফগের অনুসরণ করলেন। তখনও তিনি আশা করছিলেন ফগ নিশ্চয়ই আদালতে মামলার দিন সময়মতো এসে হাজির হবেন, অত টাকা কিছুতেই জলে ফেলবেন না। কিন্তু যখন দেখলেন, ফিলিয়াস ফগ তার সঙ্গিনী ও পাসপার্তুকে নিয়ে রেঙ্গুন জাহাজে উঠলেন, তখন রাগে-ক্ষোভে নিজের মাথার চুল ছিড়তে-ছিড়তে বললেন : উঃ! কী ভয়ানক লোক! একমুহূর্তে অত টাকা নষ্ট করলে! নিশ্চয়ই ও দস্যু! যদি দরকার হয় তবে ওর সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর শেষসীমায় পর্যন্ত যেতে দ্বিধা করবো না। হেস্তনেস্ত একটা করতেই হবে!

এস. এস. রেঙ্গুন ছিলো মংগোলিয়ার মতোই দ্রুতগামী। কিন্তু আরোহীদের থাকবার বন্দোবস্ত ছিলো মংগোলিয়াতেই ভালো। যাতে রানী আউদার কোনো অসুবিধে না-হয়, সেজন্যে ফগ বিশেষ বন্দোবস্ত করলেন।

রানী আউদা ক্রমশ ফগের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। তার প্রাণ-রক্ষার জন্যে সর্বদাই ফগকে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, বম্বাইয়ের বড়ো ব্যবসায়ী সার জামসেদজি জিজিভাইয়ের সঙ্গে তার আত্মীয়তা আছে। সার জামসেদজির ভাগ্নে থাকেন হংকং। আউদা তারই আশ্রয়ে যেতে চান। কিন্তু তিনি আউদাকে গ্রহণ করবেন কি না, কে জানে? যদি গ্রহণ না-করেন, তাহলে নিজের দশা কী হবে সেই ভাবনায় আউদাকে ব্যাকুল হয়ে পড়তে দেখে ফগ বললেন, সে-জন্যে ভাববেন না। সবই ঠিক হয়ে যাবে।

রেঙ্গুন জাহাজে সমুদ্রযাত্রার প্রথম ভাগ ভালোভাবেই কেটে গেলো। দেখতে-দেখতে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পেছনে ফেলে তরতর করে জল কেটে-কেটে রেঙ্গুন এগুতে লাগলো।

শিকার হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে বিলেতের ওয়ারেন্ট হংকং-এ পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে ফিক্সও রেঙ্গুনে এসে উঠেছিলেন। পাছে পাসপার্তুর সঙ্গে জাহাজে দেখা হয়ে যায়, এই ভয়ে খুব সাবধানে থাকতে লাগলেন তিনি। হংকংই হলো তার শেষ আশার জায়গা। দস্যুকে হংকং-এ ধরতে না-পারলে আর ধরা যাবে না। হংকং-এর পরই তো চিন, জাপান, আমেরিকা। সাধারণ একটা ওয়ারেন্ট ব্রিটিশ এলাকার বাইরে চলবে না। এ-সব

জায়গায় দস্যুকে গ্রেপ্তার করতে হলে বিশেষ ওয়ারেন্ট আনতে হবে, সেজন্যে প্রচুর সময় চাই। তদ্দিনে ফিলিয়াস ফগ যে কোথায় লুকিয়ে পড়বেন, কে জানে!

ফিক্স মহাসমস্যার মধ্যে পড়লেন। হাজার চেষ্টা করেও এতক্ষণের মধ্যেও ফগের চুলের ডগাটি পর্যন্ত স্পর্শ করা গেলো না। হংকং-এ যদি দস্যুকে পাকড়াও করা নাযায়, তবে তো তাঁর নিজের সুনাম নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে। যে-করেই হোক হংকংএ কিস্তিমাৎ করতেই হবে। পাসপার্তুকে সব কথা খুলে বলা উচিত হবে কি না, ভাবতে লাগলেন ফিক্স। বললে সে হয়তো দস্যুর সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে ফিক্সকেই সাহায্য করবে। কিন্তু, যদি না-করে? যদি ফগকে সে ফিক্সের মৎলব ফাস করে দেয়! তবে তো এত হয়রানি খামকা পণ্ড হয়ে যাবে। না— নেহাৎ দায়ে না-ঠেকলে কোনো কথা প্রকাশ করা চলবে না বলেই ফিক্স মনে-মনে ঠিক করলেন।

ফগের নতুন সঙ্গিনীটি কে, সে-প্রশ্নও ফিক্সের মনে আলোড়ন তুললো। তিনি বুঝতে পারলেন, বম্বাই থেকে কলকাতার পথেই এই ভদ্রমহিলা জুটেছেন। ভদ্রমহিলা অপূর্ব সুন্দরী—বোধহয় এর জন্যেই ফগ টাকা চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছেন। এবার সব সমস্যার উপর ফিক্স একটি আলোকসম্পাত করতে পারলেন। টাকা চুরি করে এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ফগ অন্যকোথাও চলে যাবার মৎলব এঁটেছেন।

ভদ্রমহিলা বিবাহিতা কি-না ফিক্স সে-প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামালেন না। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন ফিলিয়াস ফগ ভদ্রমহিলাকে অপহরণ করেই নিয়ে যাচ্ছেন। অমনি এক মৎলব মাথায় খেলে গেলো ফিক্সের। নারীহরণের অপরাধে তো ফগকে গ্রেপ্তার করা যায়!

কী মুশকিল! রেঙ্গুন যে আবার হংকং চলেছে! ফগ যেমন জাহাজ থেকে জাহাজে, রেল থেকে রেলে লাফ দিতে-দিতে চলেছেন, তাতে হংকং-এ গিয়েও বেশি দেরি করবেন বলে বোধ হয় না। অবশ্যি একটা কাজ করা যায়। সিঙ্গাপুর থেকে হংকং-এর পুলিশকে তারে খবর পাঠিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলা যায়। তাহলে জাহাজ হংকং-এ ভেড়বার সঙ্গেসঙ্গেই ফগকে গ্রেপ্তার করা যাবে। কিন্তু আগে পাসপার্তুকে ধাপ্পা দিয়ে ভিতরের খবর বার করতে হবে।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফিক্স জাহাজের ডেকে এসে দেখতে পেলেন, পাসপার্তু পায়চারি করছে। তাকে দেখেই সাগ্রহে ফিক্স এগিয়ে গেলেন। আরে! তুমি যে রেঙ্গুন জাহাজে?

কে? মিস্টার ফিক্স যে! সেই বম্বাইতে আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো, না? আপনিও সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে বেরিয়েছেন নাকি?

উঁহু, ও-সব বদখেয়াল আমার নেই। কিছুদিন হংকং-এই থাকবো ভাবছি।

তা-ই নাকি! তা আপনাকে তো অ্যাদ্দিন ডেকের উপর দেখতে পাইনি। কলকাতা ছেড়েছি তো বেশ কিছুদিন হলো।

একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম বলে একদিন বেরুতে পারিনি! কী জানি কেন, বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগর আমার ধাতে সয় না। সে-কথা যাক, তা তোমার কর্তা মিস্টার ফগ কেমন আছেন?

ভালোই আছেন তিনি। ঠিক সময়েই সব কাজ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মহা-মুশকিলে পড়েছিলাম। আমি হলে তো হালই ছেড়ে দিতাম, কিন্তু তিনি আলাদা ধাতুতে গড়া বলেই এখনও পেছ-পা হননি।

এই বলে পাসপার্তু ফিক্সের কাছে সব-কিছু খুলে বললে। মালাবারের মন্দিরে তার দুর্দশা, খোলবিতে হাতি কেনা, পিল্লাজির মন্দিরে সতীদাহ, কলকাতার আদালতে বিচার ও জামিনে খালাশ—সবকিছুই একে-একে ফিক্সকে বললো সে। ফিক্স এর কিছু কিছু ভালোই জানতেন। তবু না-জানার ভান করে মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন : আউদা তাহলে তোমাদের সঙ্গেই চলেছেন? মিস্টার ফগ কি তাকে ইওরোপে নিয়ে যাবেন নাকি?

না, তা কেন? সে কি আর হয় কখনও? হংকং-এ আউদার কে-এক আত্মীয় আছেন। শুনেছি তিনি হংকং-এর একজন বড়ো ব্যাবসাদার। তারই কাছে তাকে রাখতে যাচ্ছি আমরা।

সব শুনে ফিক্স কিন্তু খুব মুষড়ে পড়লেন। হতাশ হয়ে ভাবলেন, এ-পথে তাহলে কিছুই হবে না! মুহূর্তের মধ্যে হতাশার ভাব গোপন করে তিনি পাসপার্তুকে বললেন : এসো, একগেলাশ জিন খাওয়া যাক। অনেকদিন বাদে দেখা হলো।

পাসপার্তু শুনে তো খুব খুশি। বললে : চলুন। দু-এক গেলাশ জিন ছাড়া রেঙ্গুন জাহাজে আর কী করেই বা সময় কাটানো যাবে!

দুজনে জাহাজের খাবার-ঘরের দিকে এগুলো।

৭. ডিটেকটিভ ফিক্সের তৎপরতা

এর পরও জাহাজে পাসপার্তুর সঙ্গে ফিক্সের অনেকবার দেখা হয়েছিলো। কিন্তু তার রকম-শকম দেখে ফিক্স আর তার কাছ থেকে কোনো খবর বার করবার কোনো চেষ্টাই করেননি। কিন্তু তবুও ব্যাপারটা আর সোজাভাবে নিতে পারলো না পাসপার্তু। সে ভাবতে লাগলো : আমরাও যেখানে যাই, ফিক্সকেও সেখানে দেখা যায়! ব্যাপারটা বড্ড ঘোরালো ঠেকছে তো! নিশ্চয়ই ও-ব্যাটা একটা স্পাই। ফগ সত্যি-সত্যিই পৃথিবী ঘুরছেন কি না, নিশ্চয়ই তা-ই ও গোপনে দেখে যাচ্ছে। সে বড় চটে উঠলো। ফিলিয়াস ফগের মতো একজন ভদ্রলোকের পিছনে টিকটিকি লাগানো। সে মনে-মনে ঠিক করলে : আচ্ছা, আমিও দেখবো ফিক্স কত শক্তি ধরেন, আর রিফর্ম ক্লাবই বা কত বড়ো ক্লাব?

এই আবিষ্কার সে মনে-মনে খুশিই হয়ে উঠলো। ঠিক করলে যে, যখুনি সুবিধে পাবে, তখুনি টিকটিকি-সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করে নেয়া যাবে। দেখা যাবে, তিনি কতটা বাহাদুর।

তিরিশে অক্টোবর বুধবার বিকেলবেলা রেঙ্গুন মলাক্কা প্রণালীতে ঢুকলো। পরদিন ভোর চারটের নির্দিষ্ট সময়ের বারো ঘণ্টা আগেই পৌঁছুলো সিঙ্গাপুরে। জাহাজের লোকজন কয়লা তুলতে লাগলো জাহাজে। ফিলিয়াস ফগ হাতে কিছু সময় পেয়ে খুশি হয়ে শহরটা দেখবার জন্যে আউদাকে নিয়ে বন্দরে নামলেন। ফি অবশ্যি তাদের পিছু নিতে ছাড়েননি। পাসপার্তু ফিক্সকে পিছু নিতে দেখে মনে-মনে বেশখানিকটা হেসে নিলে।

বেলা এগারোটার সময় রেঙ্গুন কয়লা তোলা শেষ করে নোঙর তুললো। কয়েকঘণ্টা বাদেই জাহাজের আরোহীদের দৃষ্টি থেকে মলাকার উঁচু পাহাড়গুলো দিগন্তে বিলীন হয়ে গেলো। হংকং তখনও তেরোশো মাইল দূরে। ফিলিয়াস ফগ মনে-মনে হিশেব করে নিলেন যে, দিন-ছয়েকের ভিতরেই হংকং পৌঁছুনো যাবে, আর ছয়ই নভেম্বরের ভিতরে অনায়াসেই ইয়োকাহামার উদ্দেশে রওনা হওয়া যাবে।

এতদিন অব্দি ভালোই ছিলো আবহাওয়া। হঠাৎ অল্প-অল্প ঝড় শুরু হলো। জাহাজের গতি দ্বিগুণ করা হলো। তরতর করে জল কেটে এগিয়ে চললো রেঙ্গুন। কিন্তু তুফানও তার সঙ্গে তাল রেখে বেড়েই চললো। তুফান সামলে চলতে গিয়ে রেঙ্গুনের গতি কিছুটা কমে এলো। পেনিনসুলার অ্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল কম্পানির জাহাজিরা কিন্তু খুব ওস্তাদ। ওস্তাদ নাবিকেরা তাদের যতটুকু সাধ্যে কুলোয় তার চেয়েও বেশি করতে লাগলো। পাসপার্তু কিন্তু তা সত্ত্বেও জাহাজের ক্যাপ্টেনকে মনে-মনে গাল পাড়তে লাগলো। আউদাও খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু ফিলিয়াস ফগের নির্বিকার। ভাবলেশহীন মুখে চিন্তার কোনো ছাপই দেখা গেলো না।

ওদিকে ফিক্স কিন্তু তার গোয়েন্দাগিরি কখনও ছাড়েননি। একদিন ফিক্স কথাপ্রসঙ্গে পাসপার্তুকে শুধোলেন : কী হে! হংকং-এ পৌঁছুবার জন্যে তোমরা দেখি বড্ড

বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছো! কী ব্যাপার বলো তো! অত তাড়া কেন?

পাসপার্তু মনে-মনে চটে উঠে ছোট্ট করে একটা জবাব দিলে: তা, তাড়া একটু আছে বৈ কি। গন্তব্য যদি কিছু থাকে তবে সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়াই ভালো।

মিস্টার ফগ কি সেখান থেকেই ইয়োকোহামার জাহাজ ধরবেন? সেজন্যেই বুঝি তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন?

পাসপার্তু এবারে ছোট্ট করে জবাব দিলে : হ্যাঁ। আচ্ছা-হে, এই রহস্যময় পৃথিবী-ভ্রমণের কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়?

নিশ্চয়ই বিশ্বাস হয়। কেন? আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?

মোটেই না।

পাসপার্তু রেগে উঠে বললে : হুঁ, সেয়ানা কুকুর!

তার কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন ফিক্স। তাহলে কি আমি যে ডিটেকটিভ সেখবর প্রকাশ হয়ে গেছে নাকি? কিন্তু কেউ তো জানে না যে আমি ডিটেকটিভ! তাহলে লোকটা জানলে কী করে? সেদিন আর-কোনো কথা জিগেস করতে তার আর সাহসে কুলোললা না।

কিন্তু পাসপার্তু নাছোড়বান্দা। আরেকদিন সে নিজেই শুধধলে : তাহলে, মিস্টার ফিক্স, হংকং-এও কি আপনাকে আমাদের পেছনে দেখবার সৌভাগ্য হবে?

তার কথা বলার ধরন দেখে ফিক্স একটু কিন্তু-কিন্তু করলেন। পাসপার্তু বললে : আপনি যদি বরাবর আমাদের সঙ্গে থাকেন-উঃ, তাহলে কী খুশিটাই না হবো চলুন

আমাদেরই সঙ্গে। পেনিনসুলার অ্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল কম্পানির এজেন্টের পক্ষে মাঝপথে থেমে যাওয়াটা কি ভালো দেখায়? আপনার লক্ষ্য তো গোড়ায় ছিলো বম্বাই অব্দি, এখন তো দেখছি চিনেই এসে পড়েছেন প্রায়। আর ঐ-তো আমেরিকা! আর সেখান থেকে ইওরোপ? সে-তো ব্যাঙের লাফের একলাফ!

ফিক্স তীব্র চোখে তার দিকে তাকালেন, কিন্তু তার চোখে সন্দেহজনক কিছু দেখতে-পেয়ে বললেন : তা...হা-ও, না-ও। এ-চাকরিতে ভালো-খারাপ দুই-ই আছে।... তুমি নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছে যে আমি নিজের পয়সায় শখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি না।

পাসপার্তু হেসে বললে : সে আর আপনাকে বলতে হবে না।

ওকে আর ঘাঁটানো সুবিধের মনে না-করে ফিক্স নিজের ক্যাবিনে এসে ঢুকলেন। রাজ্যের ভাবনা-চিন্তা এসে তাকে বিব্রত করে তুললো। তাহলে ও আমাকে চিনে ফেলেছে-এ-কথা ভাবতে-ভাবতে তার মাথায় এক বাহাদুর মৎলব খেলে গেলো। ও যখন আমাকে চিনেই ফেলেছে, তখন হংকং-এ নেমেই আমার সব কথা ওকে খুলে বলবো। হয়তো ও ঐ চোরটার কীর্তি-কাহিনী জানে না। তার কাণ্ড-কীর্তির কথা শুনলে তাকে পুলিশে দিতে ও আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্যই করবে।

ওদিকে ফিলিয়াস ফগ তখন স্থির চোখে ঝড়ে-মেতে-ওঠা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যাত্রার মধ্যে এ-রকম বিঘ্ন দেখা দিলে বিচলিত হয়ে পড়ারই কথা বিশেষ করে এ-রকম কোনো বেপরোয়া বাজির ব্যাপারে। কিন্তু ফগের মুখে চিন্তার কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না, বরং দেখা গেলো কঠিন আত্মবিশ্বাসের সুস্পস্ট লক্ষণ।

ওদিকে পাসপার্তু কিন্তু খুব অস্থির হয়ে পড়লো। সে রেঙ্গুনের নাবিকদের সাধ্যাতীত সাহায্য করতে লাগলো—পারলে সে একাই হয়তো দশজনের কাজ করে দিতে। তার কর্মপটুতা দেখে সকলেরই তাক লেগে গেলো। আউদাও ফিলিয়াস ফগের এ-বিপদে খুব ঘাবড়ে গেলেন।

তুফান অবিশ্যি শেষ অব্দি একসময় থেমে গেলো, কিন্তু রেঙ্গুন গিয়ে হংকং পৌঁছুলো নির্দিষ্ট সময়ের পুরো একদিন পরে। ইয়োকোহামার জাহাজ বুঝি ছেড়ে গিয়েছে! পাসপার্তু আর খবর-টবর নিতে সাহস করলে না। যদি শোনা যায় যে ছেড়ে দিয়েছে, তবে উপায়? এর চেয়ে বরং জাহাজঘাটায় না-গিয়ে মনে-মনে আশা পুষে রাখাই ভালো। দুঃসংবাদ শুনতে-পাওয়ার চেয়ে কোনো সংবাদ না-জানাই তার কাছে ভালো বলে মনে হলো। ফিক্স অবিশ্যি ওদের এই দুরবস্থায় খুশি হয়ে মনে-মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে ইয়োকাহামার জাহাজ যেন ওরা পৌঁছুবার আগেই ছেড়ে দেয়।

বন্দরের পাইলট জাহাজে উঠলে একটুও বিচলিত না-হয়ে অতীব-শান্ত সুরে ফিলিয়াস ফগ জিগেস করলেন : ইয়োকোহামার জাহাজ কি চলে গিয়েছে?

না। জাহাজের বয়লার খারাপ হয়ে গিয়েছিলো বলে সময়মতো ছাড়তে পারেনি।

কখন ছাড়বে তাহলে?

কাল সকালে জোয়ার এলে ছাড়বে।

ফিলিয়াস ফগ শুধালেন : জাহাজটার নাম কী?

পাইলট জবাব দিলে : কর্নাটিক।

ফগ তাকে ধন্যবাদ জানালেন। পাসপার্তু তো আহ্লাদে আটখানা, আনন্দে তার হাত সজোরে চেপে ধরে বললে : পাইলট, আপনি খুব ভালোমানুষ?

পাইলট এভাবে আচমকা সম্মানিত হবার কোনো কারণ বুঝতে না-পেরে অবাক হলো বটে, কিন্তু কারণ জানবার অপেক্ষা না-করেই শিস দিতে-দিতে তার কাজে চলে গেলো। বেলা একটার সময় রেঙ্গুন জেটিতে এসে লাগলো। যাত্রীরা সব ওঠা-নামা করতে লাগলো।

অদৃষ্ট যে ফিলিয়াস ফগের উপর খুব খুশি, এ-কথা কোনোমতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। জাহাজের বয়লারটা যদি খারাপ না-হতো, তবে জাহাজ দিতো ছেড়ে, আর তার পরের জাহাজের অপেক্ষায় সময় নষ্ট হতে আটদিন। এ-কথা অবিশ্যি সত্যি যে তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টা দেরি করে আসতে হয়েছে, কিন্তু সেজন্যে বিশেষ কোনো লোকশান হবে না। যে-জাহাজ ইয়োকোহামা থেকে সান-ফ্রান্সিসকো যাওয়া-আসা করে, হংকং-এর জাহাজ না-পৌঁছুলে পর তার ছাড়বার নিয়ম ছিলো না। কেননা সে এই জাহাজের যাত্রীদের নিয়েই মার্কিন মুলুক যায়। যদিও এই পঁয়ত্রিশদিনে ফগ তার হিশেবের চেয়ে একদিন বেশি সময় লাগিয়েছেন, তবু প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে বাইশদিনের। যাত্রায় সেটুকু পুষিয়ে নেবার ভরসা আছে।

পরদিন ভোর পাঁচটার আগে কনাটিক তো হংকং ছাড়বে না, কাজে-কাজেই শহরে যেটুকু কাজ ছিলো সেটুকু সেরে নেয়ার জন্যে সবশুদু ষোলো ঘণ্টা সময় পাওয়া গেলো। সোজাকথায়, আউদার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্যে ফগ যোলো ঘণ্টা সময় হাতে পেলেন।

জাহাজ জেটিতে লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই আউদাকে নিয়ে ফিলিয়াস ফগ নামলেন জাহাজ থেকে। তারপর একটা ভালো হোটেলের খোঁজ করে গেলেন সেখানে। সেখানে পাসপার্তুকে তার না-ফেরা পর্যন্ত হোটেলে থাকবার নির্দেশ দিয়ে তিনি চললেন স্টকএকচেঞ্জের সন্ধানে। তিনি ভেবেছিলেন যে জিজিভাইয়ের ভাগ্নে যখন খুব-বড়ো ব্যবসায়ী, তখন সেখানে নিশ্চয়ই তাঁর শুলুকসন্ধান পাওয়া যাবে।

খবর অবিশ্যি ফিলিয়াস ফগ পেলেন, কিন্তু দেখা পেলেন না। অঢেল টাকা-পয়সা কামিয়ে নিয়ে তিনি বছর-দুই আগে ইওরোপ চলে গেছেন। ওলন্দাজদের সঙ্গে তার কারবার ছিলো, খুব-সম্ভব তিনি চিন থেকে নেদারল্যাণ্ডস-এই গিয়েছেন।

তক্ষুনি হোটেলে ফিরে ফিলিয়াস ফগ আউদাকে সব খুলে বললেন। সব শুনে তো আউদা খানিকক্ষণ মুহ্যমান হয়ে রইলেন। তারপর গালে হাত দিয়ে আরো খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে কাপাগলায় তিনি শুধোলেন : তাহলে, মিস্টার ফগ? আমার উপায়?

এ-তো খুব সহজ ব্যাপার। ফিলিয়াস ফগ জবাব দিলেন : চলুন-না ইওরোপেই।

কিন্তু..কিন্তু তাতে আপনার এতটা অসুবিধে..

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

না, না! ও-কী বলছেন? আপনি থাকলে আমার সময়সূচির কোনো ক্ষতিই হবে। এই বলে তিনি পাসপার্তুকে ডাকলেন। বললেন : কাটিক জাহাজের তিনটে ক্যাবিন রিজার্ভ করে এসো, শিগগির। চটপট।

পাসপার্তু তক্ষুনি হালকা মনে শিস দিতে-দিতে টিকিট কাটতে রওনা হলো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে শহর দেখতে-দেখতে এগিয়ে চললো ভিক্টরিয়া বন্দরের দিকে। রাস্তায় চিনা, জাপানি, আর ইওরোপিয়দের ভিড়। হংকং অনেকটা বম্বাই, কলকাতা কিংবা সিঙ্গাপুরের মতন সে-হিশেবে। বিশ্বের প্রায় সবদেশেরই লোক সেখানে এসে আস্তানা গেড়েছে।

পাসপার্তু ক্যান্টন নদীর মুখে ভিক্টরিয়া বন্দরে এসে হাজির হলো। যে-জেটি থেকে কর্নাটিক ছাড়বে, পাসপার্তু সেখানে এসে দেখলো, ডিটেকটিভ ফিক্স কেমন যেন হালছাড়াভাবে ভাঙামনে পায়চারি করছেন। পাসপার্তু মনে-মনে বললে : হু! রিফর্ম ক্লাবের ভদ্রলোকের গতিক-সতিক দেখে তো বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। সে হাসতে-হাসতে সরাসরি ফিক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে।

ফিক্স কিন্তু বিনাকারণে ওভাবে কাচুমাচু মুখভঙ্গি করে পায়চারি করছিলেন না। তখনও বিলেত থেকে ওয়ারেন্ট এসে পৌঁছোয়নি। কয়েকদিন হংকং-এ অপেক্ষা করে–থাকলে ওয়ারেন্ট পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। হংকং হচ্ছে ইংরেজের দখলে এদিককার শেষ জায়গা—কাজেই হংকং-এ দস্যুকে ধরতে না-পারলে তাকে এর পরে আর ধরবার সুযোগ নেই। অতএব ফি তখন সেই মহাসংকটে পড়ে কী অস্থির চিন্তায় পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলেন, তা কেবল তার মতো ভুক্তভোগী ধুরন্ধর গোয়েন্দা ছাড়া আর-কেউ বুঝতে পারবে না।

পাসপার্তু সেদিকে খেয়াল না-করে একগাল হেসে শুধোলে : কী খবর, মিস্টার ফিক্স? আপনি তাহলে আমাদের সঙ্গেই আমেরিকা যাচ্ছেন?

দাঁত কিড়মিড় করে কোনোমতে রাগটা চেপে ফিক্স বললেন : হ্যাঁ।

অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো পাসপার্তু : আসুন, আসুন! আমি কি আগেই বলিনি, আপনি কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়তে পারবেন না। আসুন, আসুন-আপনার প্যাসেজ বুক করে নিন।

দু-জনে তখন কম্পানির আপিশ-ঘরে গিয়ে চারখানা কামরা রিজার্ভ করে এলো। কেরানিবাবু তাদের বললে যে, কর্নাটিকের মেরামত শেষ হয়ে গেছে, কাজে-কাজেই মিথ্যে আর জেটিতে সময় না-কাটিয়ে পরদিন ভোরে জাহাজ না-ছেড়ে সেদিনই সন্ধে আটটার সময় জাহাজ ছাড়বে।

পাসপার্তু বললে : তাহলে তো খুবই ভালো হলো। মিস্টার ফগের সময়সূচির সঙ্গে চমৎকার খাপ খাবে এ। যতটা সময় নষ্ট হবে বলে আশঙ্কা করছিলেন, বাস্তবে তার খানিকটা এতেই পুষিয়ে যাবে। যাই, গিয়ে সুখবরটা জানিয়ে আসি।

আর নয়, সেই মুহূর্তেই মন ঠিক করে ফেললেন ফিক্স। ভাবলেন, এইমুহূর্তে পাসপার্তুকে সবকিছু খুলে বলবেন, নইলে এ-জীবনে আর ব্যাংক-দস্যুকে পাকড়াবার সুযোগ হবে না। পথে বেরিয়ে জাহাজ-ঘাটার কাছে একটা রেস্তোরাঁ দেখে ফিক্স বললেন : এসো-হে, কিছু

জলযোগ করে নেয়া যাক! পাসপার্তু কোনো দ্বিরুক্তি না-করে তার সঙ্গে গিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকলো।

রেস্তোরাটা বেশ বড়োসড়ো। তারা দুজনে একটা সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। ঘরটার একপাশে একটা ক্যাম্প-খাট। পাসপাড়ু দেখলে কতগুলো তোক সেই বিছানায় লম্বা হয়ে চিৎপাত পড়ে আছে, সবাই ঘুমিয়ে কাদা। আরো-জনাকয়েক লোক ছোটো-ছোটো টেবিলের চারপাশে বসে কেউ বিয়ার বা পোর্ট, কেউ ব্র্যান্ডি, কেউ-বা অন্য-কোনো পানীয় গলাধঃকরণ করতে-করতে গল্প করছিলো। অনেকে মাটির তৈরি লাল-রঙা বড়ো-বড়ো নলচেতে গোলাপজলে ভিজোনো আফিং-এর গুলি ভরে ধূমপান করছিলো। যারা আফিং-এর নেশায় জ্ঞান হারিয়ে টেবিলের নিচে পড়ে যাচ্ছিলো, ওয়েটাররা তাদের ধরাধরি করে ক্যাম্প-খাটে শুইয়ে দিচ্ছিলো। পাসপার্তু দেখলে, জনাকুড়ি লোক সেই বিছানায় ওভাবে নেশায় বুদ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে পাশাপশি শুয়ে রয়েছে।

ফিক্স আর পাসপার্তু সব দেখে-শুনে বুঝতে পারলে এটি রেস্তোরাঁ নয়, চিনেদের একটা গুলির আড়া। চিনা গবর্মেন্ট অনেক চেষ্টা করেও এই নরককুণ্ডগুলোকে বন্ধ করে দিতে পারেনি। তারা দুজনে দুটো চেয়ার দখল করে বসলো। পাসপার্তুর কাছে জাহাজের ক্যাবিন রিজার্ভ করার পর আর বাড়তি টাকাকড়ি ছিলো না। ও ফিক্সের বন্ধুত্বের খাতিরেই এখানে এসেছিলো।

দু-বোতল পোর্টের হুকুম দিয়ে ফিক্স গাসপার্তুকে নানান ধরনের লম্বাই-চওড়াই গল্প শোনাতে লাগলেন। পাসপার্তু বোতলকে-বোতল একাই সাবাড় করে দিলে ফিল্ম চালাকি করে ওকে বেশি মদ খাইয়ে নিজে নামমাত্র ছুঁলেন কি না-ছুঁলেন। হঠাৎ পাসপার্তুর

খেয়াল হলো যে জাহাজ ছাড়বার সময় বদলে গিয়েছে আর সেটা তার কর্তা জানেন না। সে তক্ষুনি উঠে পড়ে বললে: জাহাজ তো সন্ধের সময় ছাড়বে। আমি উঠি। গিয়ে কর্তাকে খবর দিতে হবে।

ফিক্স তাকে বাধা দিয়ে বললেন : সবুর, সবুর, একমিনিট অপেক্ষা করো।

কেন? কোনো দরকার আছে?

তোমার সঙ্গে একটা সাংঘাতিক জরুরি ব্যাপারে কথা বলতে চাই।

সাংঘাতিক জরুরি ব্যাপার? সে-কী? তা বেশ। আপনিও তো আমাদের সঙ্গে চলেছেন, কাল সকালেই এ নিয়ে আলাপ করা যাবেখন। আজ আর আমার সময় নেই।

থামো। ফিক্স এবারে কড়াসুরে বললেন : কাল শুনলে চলবে না। কথাটা জরুরি, আর তোমার কর্তার সম্বন্ধেই।

ফিক্সের গলার স্বরে এমন কড়া ধাতানির ভাব লক্ষ করে খানিকটা অবাক হয়ে তীব্রদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালে পাসপার্তু। কর্তার সম্বন্ধে? বেশ, বলুন। আবার সে চেয়ারে বসলো।

ফিক্স পাসপার্তুর হাত ছুঁয়ে নিচুগলায় বললেন : আমি কে, তুমি কি তা বুঝতে পেরেছো?

মুচকি হাসলো পাসপার্তু। নিশ্চয়ই পেরেছি। মনে-মনে বললে, তুমি যে একটা মিচকে শয়তান, তা কি আমার আর বুঝতে বাকি আছে।

সবকিছুই আমার জানা আছে। না, না, মিস্টার ফিক্স, একে বুদ্ধিমানের কাজ বলা চলে না মোটেই। আচ্ছা, বলুন, কী বলবেন। কিন্তু তারা যে আপনাকে পাঠিয়ে খামকা হয়রান হচ্ছেন আর এত টাকা গচ্চা দিচ্ছেন।

খামকা! ফিক্স উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে কত টাকার মামলা, তা তুমি জানো না।

পাসপার্তু জবাব দিলে : জানি কত টাকা। তিন লাখ টাকা মানে কুড়ি হাজার পাউণ্ড তো?

ওর হাতে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ফিক্স বললেন : পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড!

কী? পাসপার্তু আর নিজেকে সামলাতে পারলে না, গলাছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলো। কী বললেন? পঞ্চান্ন হাজার? তাহলে তো এখানে আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট করাও অন্যায়। সে উঠে দাঁড়াতেই ফিক্স আবার তাকে ধরে টেনে বসিয়ে বললেন : হ্যাঁ, পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড। পাসপার্তুর দিকে মদের গ্লাসটা এগিয়ে দিলেন তিনি। পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড। আর আমি যদি সফল হই তাহলে পাবো দু-হাজার পাউণ্ড। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো, তাহলে তোমাকেও পাঁচশো দেবো।

আপনাকে সাহায্য করবো? অবাক হয়ে কেমন হতভম্বভাবে তার দিকে তাকালে পাসপার্তু। তার মানে?

হ্যাঁ, সাহায্য করবে। যাতে মিস্টার ফগ এখানে কয়েকটা দিন আটকে পড়ে থাকেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কী? চেঁচিয়ে উঠলো পাসপার্তু। এ আপনি বলছেন কী? আমার মনিব ভালোমানুষ মিস্টার ফগের পিছনে স্পাই লাগিয়েও তাদের তৃপ্তি হয়নি, আবার যাতে ঠিক সময়ে লণ্ডনে পৌঁছতে না পারেন, তার ব্যবস্থাও করতে চান? ছি-ছি-ছি।

তোমার কথা তো আমি বুঝতে পারছিনে!

উঃ! কী ছোটোনজর! পাসপার্তু বলে চললো। তাহলে তো তারা দেখছি মিস্টার ফগের পকেট মারতেও পেছ-পা হবে না!

আমরা তো ঠিক তা-ই করত চাচ্ছি।

নির্জলা মদ পাসপার্তুকে ক্রমশ উত্তেজিত করে তুলছিলো। এ তাহলে ভয়ংকর একটা ষড়যন্ত্র! আবার তারাই মিস্টার ফগকে বন্ধু বলে পরিচয় দেয়, ভদ্রলোক হিশেবে পরিচিত হয়!

তার কথা শুনে ফিক্স বড় গোলে পড়লেন। তার কথা ফিক কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। সব কী-রকম একটা হেঁয়ালির মত ঠেকছিলো তাঁর কাছে।

পাসপার্তু রেগে বলে চললো : এরাই কি-না বন্ধু! এরাই আবার রিফর্ম ক্লাবের সভ্য! মিস্টার ফিল্ম, আপনি কি এখনও কর্তাকে চিনে উঠতে পারেননি? তার মতো মহৎ লোক

ক-টা দেখছেন আপনি? তিনি যে-বাজি ধরেছেন, তা তিনি সৎপথেই জিতে নেবেন, কোনো ফেরেব্বাজি করবেন না। তিনি তো আর ঠগ-জোচ্চোর-জালিয়াত নন।

পাসপার্তুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ফিক্স বললেন : আমি যে কে, তা কি তুমি ঠিকঠাক বুঝতে পেরেছো?

আপনি! পাসপার্তু বললে : আপনি রিফর্ম ক্লাবের একটা স্পাই, খোচর। মিস্টার ফগকে পথে আটকে রাখবার জন্যেই আপনি আমাদের পিছু-পিছু কুকুরের মতো ছুটে এসেছেন। আমি তো অনেক আগেই আপনাকে চিনেছি, নেহাৎ মনে দুঃখ পাবেন বলেই মিস্টার ফগকে কিছু বলিনি! এবার দেখছি বললেই ভালো করতুম!

ফিক্স ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি শুধোলেন তাহলে মিস্টার ফগ আমার কথা কিছুই জানেন না?

মদের গ্লাসটা এক-চুমুকে শেষ করে পাসপার্তু বললে : না। তিনি এর কিছুই জানেন না।

ধুরন্ধর ডিটেকটিভ ফিক্স দু-হাতে কপাল টিপে ধরে পলকের মধ্যেই নিজের কর্তব্য ভেবে নিলেন। তিনি দেখলেন পাসপার্তু খুব সরল শাদাসিধে মানুষ, নিশ্চয়ই ব্যাংকলুঠে মিস্টার ফগের সাহায্য করেনি। ফিক্স ভাবলেন, যদি তা-ই হয়, তাহলে আমার সত্যিকার পরিচয় পেলে ও নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে। বেশি ভাববার সময়ও তখন ছিলো না। যে-করেই হোক মিস্টার ফগকে হংকং-এ আটকে রাখতে হবেই। তক্ষুনি তার কর্তব্য ঠিক করে নিয়ে ফিক্স বললেন : শোনো, তুমি যা ভাবছো, আমি আসলে তা নই।

অবাক হয়ে গেলো পাসপার্তু। বিস্ময়ে তার চোখ ছানাবড়া। সে কী? তার মানে?

আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ। কী? বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দ্যাখো আমার কার্ড।

ফিক্স মুহূর্তের মধ্যে তার কার্ড বের করে সেই হতভম্ব ফরাশির সামনে তুলে ধরে বলতে লাগলেন, বাজি ধরার একটা মিথ্যে অছিলা তৈরি করে মিস্টার ফগ তোমাকেও ঠকিয়েছেন, আর রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদেরও ফাঁকি দিয়েছেন। তুমি যাতে কিছু বুঝতে না-পেরে তার সাহায্য করো, এই হচ্ছে তার মৎলব।

তার মানে? চেঁচিয়ে উঠলো পাসপার্তু। এভাবে ফাঁকি দিয়ে তার কী লাভ?

লাভ হচ্ছে এই–গত আঠারোই সেপ্টেম্বর ব্যাংক অভ ইংল্যাণ্ড থেকে যে পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড চুরি যায় তা কার কাণ্ড জানো? মিস্টার ফগেরই। দস্যুর যে-ফোটো পাওয়া গেছে, মিস্টার ফগের চেহারার সঙ্গে তার হুবহু মিল আছে।

সজোরে টেবিল চাপড়ে উঠলো পাসপার্তু।অসম্ভব! এ হতেই পারে না! মিস্টার ফগের মতো সজ্জন দুনিয়ায় দুর্লভ।

আরে, তুমি আর জানবে কী করে? যেদিন মিস্টার ফগ তার খ্যাপা বাজি ধরে ছুতো করে বেরিয়ে পড়েন, তুমি তো সবে সেদিনই তার কাছে চাকরি নিয়েছিলে। মনে করো দেখি, সেদিন তার সঙ্গে কী ছিলো? কোনো জিনিশপত্র সঙ্গে ছিলো কী? কেবল একটা ব্যাগ, আর তার মধ্যে অজস্র ব্যাংক-নোট! তাছাড়া আশিদিনে কি সারা পৃথিবী ঘুরে আসা যায়?

তুমিই বলো দিকিনি এ-একটা খ্যাপার কাণ্ড, না অন্যকিছু? এখনও তুমি ওঁকে সাধু-পুরুষ বলতে চাও? আসিসির সন্ত ফ্রানসিস?

পাসপার্তু কলের পুতুলের মতো বললে : আঁ-অ্যাঁ-তারপর?

দস্যুকে সাহায্য করেছে বলে তুমিও কি জেলে পচতে চাও?

পাসপার্তু দু-হাতে তার কপালের রগ টিপে ধরলে। চোখের সামনে সারা পৃথিবী ঘুরতে লাগলো। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। হতবাক হয়ে সে ভাবতে লাগলো : কী অসম্ভব কথা! ফিলিয়াস ফগ একজন দস্যু! সেই নির্ভীক বীরপুরুষ একটা সামান্য চোর! চোর? না-না, এ অসম্ভব! কোনোমতেই এ হতে পারে না। কিন্তু ফিক্সের কথাও তো একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ফিলিয়াসের ফগের হাবভাব আচারআচরণ বেশ-একটু রহস্যময়ই-তার সবকিছুই যেন কুহেলিঘেরা। কিন্তু—কিন্তু তবুও এ অসম্ভব! রুদ্ধকণ্ঠে সে ফিক্সকে শুধোলে : তাহলে আপনি আমায় এখন কী করতে বলছেন?

আমি এতদূর অব্দি তাকে অনুসরণ করে এসেছি। ফিক্স বললেন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়ে পাঠিয়েছি, কিন্তু আজও সেই ওয়ারেন্ট এসে পৌঁছোয়নি। তোমাকে শুধু এই ব্যবস্থাই করতে হবে মিস্টার ফগ যাতে কোনোমতেই হংকং ছেড়ে যেতে না-পারেন।

কিন্তু...

বাধা দিয়ে ফিক্স বললেন : যদি পারো তবে তোমাকে একহাজার পাউন্ড দেবো।

না, না-এ কাজ আমি করতে পারবো না। পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলো পাসপার্তু–চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না উঠতে-চেয়ারে যেন তার গোটা শরীরটাই আটকে গেছে। জড়ানো গলায় সে শুধু বললে, মিস্টার ফিক্স, আপনার কথা যদি সত্যিই হয়, মিস্টার ফগ যদি দস্যুই হন—তবু আমি তার সঙ্গে বেইমানি করতে পারবো না। আমি এখনও বিশ্বাস করি, তিনি নির্দোষ, সাধু। আমি নেমকহারামি করতে পারবো না। অসম্ভব! সে আমি কোনোমতেই পারবো না। আমি আর যা-খুশি তা-ই হতে পারি, কিন্তু ইতর-কোনো বেইমান নই।

তাহলে তুমি রাজি নও? ফিক্স তাকিয়ে দেখলেন পাসপার্তু প্রায়-মাতাল হয়ে পড়েছে। তিনি বললেন : বেশ, তাহলে আমাদের মধ্যে যে-সব কথাবার্তা হলো, সেসব ভুলে যাও। এসো, আমাদের বন্ধুতার চিহ্ন হিশেবে আরেক গ্লাস করে ব্র্যান্ডি খাওয়া যাক।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে আর এত মদ খেয়ে পাসপার্তুর অবস্থা শুধু বেশামালই নয়, রীতিমত কাহিল হয়ে এসেছিলো। ফিক্স ঠিক করলেন, তাকে কোনোমতেই ফগের কাছে যেতে দেয়া চলবে না। টেবিলের উপরেই আফিংভরা সেই লালরঙা নলচেগুলো পড়ে ছিলো। ফিক্স তারই একটা তুলে দিলেন পাসপার্তুর হাতে! এমনিতেই কাহিল হয়ে পড়েছিলো পাসপার্তু, অনভ্যস্তভাবে নলে কয়েকবার জোর টান দেবার সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলো মেঝের উপর।

অবশেষে! সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন ফিক্স। এবার ফিলিয়াস ফগকে বাগে পেয়েছি। কর্নাটিক জাহাজ ছাড়ার সময় যে বদলে গেছে, সে-কথা ফিলিয়াস ফগ আর জানতেও পারবে না! এবার তাকে দেখে নেবো!

দাম চুকিয়ে দিয়ে ফিক্স চণ্ডুখানা ছেড়ে রাস্তায় বেরুলেন।

৮. ইচ্ছে থাকলে উপায়ও থাকে

এদিকে চখানায় যখন ফিলিয়াস ফগের ভবিষ্যৎ ও আশা সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে আউদাকে নিয়ে হংকঙের সাহেব-পাড়ায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তার অনুরোধে আউদা ইওরোপে যেতে রাজি হয়ে পড়ায় এতদূর পথ পাড়ি দেয়ার জন্যে কতগুলো জিনিশ কেনাকাটা করা দরকার হয়ে পড়েছিলো। ফগের মতো কোনো ইংরেজ হয়তো একটা ব্যাগ সঙ্গে নিয়েই সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে পারেন, কিন্তু কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষে তো সেভাবে বেড়ানো সম্ভব নয়।

কেনাকাটা সারা হলে পর হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফগ দ্য টাইমস আর ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ পড়তে লাগলেন। পাসপার্তু এত রাতেও ফিরে না-আসায় ফগ মোটেই চিন্তিত হলেন না, কারণ তিনি জানতেন ইয়োকোহামার জাহাজ আগামীকাল ভোরের আগে ছাড়বে না। কাজেই পাসপার্তুকে দেখতে না-পেলেও সে নিয়ে তেমনএকটা মাথা ঘামালেন না। কিন্তু পরদিন ভোরে যখন পাসপার্তুকে তিনি ডাকলেন, তখনও তার কোনো পাত্তা পাওয়া গেলো না। ফগ অবিশ্যি তখনই প্রথম শুনলেন যে আগের দিন রাত্রেও সে আসেনি। তিনি এ-সম্বন্ধে কী ভাবলেন, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কারণ তিনি এ নিয়ে কোনো কথাটি না-কয়ে, বিনাবাক্যব্যয়ে, জিনিশপত্র গুছিয়ে আউদাকে সঙ্গে নিয়ে কনাটিক জাহাজে যাবার জন্যে রাস্তায় এসে নামলেন। জেটিতে এসে শোনা গেলো আগের দিন রাত্রেই কনাটিক বন্দর ছেড়ে চলে গিয়েছে। ফগ একথা শুনে শুধু তার স্বাভাবিক গলায় আউদাকে বললেন : এ নিয়ে অযথা বিচলিত হবেন না আপনি। মোটেই হতাশ হবেন না। ইচ্ছে থাকলে একটা উপায় হবেই হবে।

ফিল্ম ওদের কাছে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে সব দেখছিলেন। এবার তিনি ফগের কাছে এসে দাঁড়ালেন। আপনিই তো কাল আমাদের সঙ্গে রেঙ্গুনে করে এসেছেন, না?

ফগ বললেন : হা-কিন্তু আপনাকে তো ঠিক...

মাপ করবেন, ভেবেছিলুম পাসপার্তুকেও আপনাদের সঙ্গে দেখতে পাবো।

আউদা ব্যগ্রকণ্ঠে শুধোলেন : সে কোথায় আছে আপনি কি জানেন মিস্টার...

আমার নাম ফিক্স। অবাক হবার ভান করলেন তিনি। সে-কী? ও কি আপনাদের সঙ্গে আসেনি?

না। কাল থেকেই তো তার পাত্তা পাচ্ছিনে! আইদা বললেন : আমি ভাবছি সে কি কর্নাটিক জাহাজেই চলে গেলো?

ও কি আপনাদের ফেলে রেখেই চলে যাবে? মাপ করবেন—আপনারাও বুঝি ঐ জাহাজে যেতে চেয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

আমিও যাবো বলে মনে করছিলুম। জাহাজখানা হঠাৎ চলে যাওয়াতে বড় অসুবিধেয় পড়লুম। খবর নিয়ে শুনলুম, মেরামতের কাজ শেষ হয়ে যাওয়াতে বারোঘন্টা আগেই জাহাজটা হংকং ছেড়ে চলে গিয়েছে। এখন তো হপ্তা-খানেকের মধ্যে আর জাহাজও পাওয়া যাবে না। দেখুন দেখি, কী মুশকিলেই না পড়লুম! ফিক্সের চোখে একটি ধূর্ত-

কুটিল হাসির ঝিলিক খেলে গেলো। একেই কি শয়তানের হাসি বলে? তিনি ভাবছিলেন, আর একহপ্তা—তার মধ্যেই ওয়ারেন্ট এসে পড়বে। তারপর ব্যাংককে গ্রেপ্তার করার গৌরব ও ইনাম তারই ওপর বর্তাবে। আর ভয় কীসের!

কিন্তু ফগ যখন তার স্বাভাবিক শান্তগলায় বললেন, কর্নাটিক ছাড়াও তো হংকং বন্দরে আরো-অনেক জাহাজ রয়েছে, তখন সে-যে কী তিনি রকম আঘাত পেলেন, পাঠক তা নিশ্চয়ই সহজে অনুমান করতে পারছেন। ফগ আর কালবিলম্ব না-করে আউদাকে নিয়ে জাহাজগুলোর পানে চললেন। ফিক্স চক্ষু ছানাবড়া করে অবাক হয়ে। তাদের অনুসরণ করলেন। কিন্তু ফিক্সের উপরই বোধহয় অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, নইলে ঘুরতেঘুরতে ঘণ্টা-তিনেক কেটে গেলো, কিন্তু এতগুলো জাহাজের মধ্যে কোনো জাহাজের ক্যাপ্টেনই ইয়োকোহামা যেতে রাজি হলো না। ফিক্সের মুখে ফের সেই ধূর্ত-কুটিল হাসিটা ফুটে উঠলো।

কিন্তু ফিলিয়াস ফগ নাছোড়বান্দা। তিনি তখনও জাহাজ-ঘাটায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পথে এক জাহাজির সঙ্গে দেখা। জাহাজি শুধোলে : সাহেব কি বিশেষ কোনো জাহাজের খোঁজ করছেন?

এক্ষুনি ছাড়তে পারে এমন কোনো স্টীম-বোটের কথা কি জানা আছে তোমার?

আছে, সাহেব। তেতাল্লিশ নম্বর পাইলট-বোটই আমার। এ-বছরে ওর চেয়ে ভালো নৌকো আর এ-তল্লাটে পাবেন না।

খুব স্পীডে যেতে পারবে তো?

ঘণ্টায় আট-ন মাইল করে চলে, সাহেব। আসুন-না, একবার চাক্ষুষ দেখবেন। দেখলেই আপনার পছন্দ হবে, সাহেব। সমুদ্রের মাঝে একটু বেড়ানো-টেড়ানোর জন্যেই বুঝি নৌকোটা চাই?

ঠিক তা নয়। এই, ধরো, সমুদ্রে পাড়ি দেয়া আর-কী! আমি ইয়োকোহামা যেতে চাই, অবিশ্যি তুমি রাজি হলে।

নাবিক হতভম্ব হয়ে ফগের পানে তাকালে। আপনি তামাশা করছেন না তো? একটা পাইলট-বোট নিয়ে ইয়োকোহামা?

তামাশা? না-না, তামাশা কেন? আমি কশাটিক জাহাজ ধরতে পারিনি। অথচ চোদ্দ তারিখের মধ্যে আমাকে ইয়োকোহামা পৌঁছুতেই হবে, দেরি হলে চলবে না। সেখানে গিয়ে আমাকে সান-ফ্রান্সিসকোর জাহাজ ধরতে হবে কি-না।

খুব দুঃখিত হলাম, সাহেব, কিন্তু, সে অসম্ভব?

আমি দিনে একশো পাউণ্ড করে ভাড়া দেবো। ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারলে আরো দুশো পাউণ্ড বখশিশ পাবে।

আপনি কি সত্যিই যাবেন, সাহেব? নাৰিকটি জিগেস করলে।

ফিলিয়াস ফগ উত্তর করলেন : নিশ্চয়ই যাবো।

নাবিক একবার আকাশের দিকে তাকালে, তারপর আবার তাকালে সেই নিঃসীম সমুদ্রের দিকে। শেষে দোটানায় পড়ে ভাবতে-ভাবতে পায়চারি করতে লাগলো : একদিকে অতগুলো টাকা, অন্যদিকে জীবনের আশঙ্কা! জীবন যদি নাও যায়, নৌকোটা বেঘোরে খোয়াবার ভয়।

ফিক্স তো ব্যাপার-স্যাপার দেখে একেবারে থ! এই বুঝি গেলো সর্বনাশ হয়ে।

ফিলিয়াস ফগ আউদার দিকে তাকালেন। ছোট্ট নৌকো আপনার ভয় করবে না তো?

না। আপনার সঙ্গে যেতে আর ভয় কীসের?

অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে নাবিক বললে : আমার ছোটো নৌকো, অত-দূর পাড়ি দিতে তাই সাহস করিনে—বিশেষ করে এই ঝড়-তুফানের সময়। সকলেরই প্রাণ যেতে পারে বেঘোরে। তাছাড়া ইয়োকোহামাও তো এখান থেকে কম-দূর নয়—যোলোশো মাইল। সময়-মতো বোধহয় পৌঁছুনোও যাবে না। তবে এক কাজ করা যেতে পারে। নাগাসিকি এখান থেকে এগারোশো মাইল, শাংহাই আটশো। শাংহাই পৌঁছুলে আমরা তীরের কাছ দিয়েই যেতে পারবো, স্রোতের টানটাও পাবো।

কিন্তু, আমাকে যে ইয়োকোহামার আমেরিকার ডাক-জাহাজ ধরতে হবে!

বেশ-ত, তা-ই হবে। সানফ্রান্সিসকোর জাহাজ তো আর ইয়োকোহামা থেকে ছাড়ে না—শাংহাই থেকেই ছাড়ে। যেতে-যেতে ইয়োকোহামা আর নাগাসিকিতে দাঁড়ায়।

তুমি ঠিক জানো তো?

ঠিক জানি। এগারোই নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা শাংহাই থেকে জাহাজ ছাড়বে। তাহলে চারদিন সময় আছে হাতে-মানে, ছিয়ানব্বই ঘণ্টা। যদি ঘণ্টায় আট মাইল করে যেতে পারি আর অনুকূল হাওয়া থাকে, তবে ঠিক সময়েই শাংহাই পৌঁছুতে পারবো।

ফিক্সের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। ঘটনাস্রোত এবার যেভাবে যেদিকটায় মোড় নিচ্ছে, তাতে দস্যুকে পাকড়াও করবার তো আর কোনো সুযোগই নেই!

ফগ নাবিকটিকে শুধোলেন : তোমরা কখন রওনা হতে পারবে?

একঘণ্টার মধ্যেই। কিছু খাবার কিনে নৌকোর পালটা বাঁধবো-এই-যা দেরি।

তবে এই কথাই রইলো। তোমারই তো নৌকো? হ্যাঁ, আমারই নৌকো। আমার নাম জন বুবি, নৌকোর নাম তংকাদিরি।

এই নাও, তোমার সুবিধের জন্যে দু-শো পাউণ্ড আগাম দিচ্ছি। ফগ নাবিকের হাতে একতাড়া নোট গুঁজে দিলেন। ফিক্স কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে

ফগ বললেন : আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তবে–

অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে। আমিই আপনার কাছে কথাটা পাড়বো বলে মনে করেছিলুম।

তাহলে আধঘণ্টার মধ্যেই আমাদের তৈরি হয়ে নিতে হবে।

আউদা বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন : কিন্তু পাসপার্তুর যে কী হলো—

তাকে আশ্বস্ত করলেন ফগ। আমার যা সাধ্য, তা আমি করবো।

পুলিশ-আপিশে গিয়ে পাসপার্তুর চেহারা বর্ণনা করে তার অনুসন্ধানের খরচ ও বিলেতে ফিরে আসবার জন্যে কিছু টাকা জমা রেখে এলেন ফগ।

বেলা তিনটের সময় সমুদ্রে পাড়ি দেয়ার জন্যে তৈরি হলো তংকাদিরি। ছোটোখাটো নৌকো হলেও খুব-মজবুত আর দ্রুতগামী। বুনসবির অধীনে আরো-চারজন নাবিক ছিলো। বুবি বেশ দৃঢ়-গঠন, অত্যুৎসাহী ও সুদক্ষ নাবিক! তংকাদিরির জন্যে তার একটা অহংকার ছিলো।

ফগ আর আউদা মালপত্র নিয়ে নৌকোয় উঠলেন। ফিক্স আগেই এসে হাজির হয়েছিলেন। তাকে দেখে ফগ বললেন : আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এ-নৌকোয় আপনার থাকার কোনো ভালো বন্দোবস্ত করতে পারছিনে। চোখ-কান বুজে কোনোরকমে এরই মধ্যে কাটিয়ে দিতে হবে।

ফিক্স মনে-মনে একটু লজ্জা পেলেন। দস্যুর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন বলে নিজের কাছেই নিজেকে বড়ো খাটো বলে মনে হলো তার। মনে-মনে ভাবলেন : লোকটা। দই হোক, আর–ই হোক, খুব বিনয়ী আর ভদ্র। প্রতিমুহূর্তেই তার আশঙ্কা হতে লাগলো, যদি হঠাৎ পাসপার্তু এসে হাজির হয়, তবেই সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু ফিক্সের বরাত ভালো। পাসপার্তুর কোনো পাত্তাই নেই। নোঙর তুলে দেখতেদেখতে তংকাদিরি বন্দর ছেড়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চললো, নীল দরিয়ার জল কেটে কেটে।

অমন-একটা ছোটো নৌকোয় করে সেই ঝড়-তুফানের সময় আটশো মাইল সমুদ্রপাড়ি দেয়া নিঃসন্দেহে খুব বিপজ্জনক ছিলো। জন বুনসবি টাকার লোভে আর ফিলিয়াস ফগ বাজি জেতবার জন্যে সে-বিপদ গ্রাহ্যই করলেন না। ফগের কথার জবাবে বুবি একবার শুধু বললে : আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। বুনসবির ওপর আপনি নির্ভর করতে পারেন। আমার যথাসাধ্য আমি করবো।

তাংকাদিরি বেশ দ্রুতবেগেই চলতে লাগলো। ফগ নোকোয় বসে সেই অথৈ অকূল সাগরের এলোমেলো উথালপাথাল ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আউদা সেই সীমাহীন সমুদ্রের পানে তাকিয়ে একটু ভয় পেলেও মুখে বা হাবেভাবে তা প্রকাশ করলেন না।

একটু পরেই সন্ধ্যা হয়ে এলো। এদিকে আকাশেও তখন অল্প-অল্প কালো মেঘ জমছিলো। প্রবল বেগে হাওয়া বইলো। তবু তংকাদিরি দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে দেখে ফগ একটু আশ্বস্ত হলেন। পুরস্কারের লোভে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো নাবিকেরা।

প্রথম দু-দিন ভালোভাবেই কেটে গেলো, কিন্তু তৃতীয় দিন ভোর থেকেই আকাশের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠলো। বিপুল উচ্ছ্বাসে ফুসে উঠলো দক্ষিণদিকের সমুদ্র। বুবি ভালো করে চারদিক দেখে ফগকে বললে : আমার আশঙ্কা হচ্ছে এক্ষুনি সাংঘাতিক ঝড় শুরু হবে। মনে হচ্ছে দক্ষিণদিক থেকেই আসবে ঝড়–একটা ঘূর্ণি-বাতাস আসছে।

ভালোই হলো। দক্ষিণের ঝড়ে আরো-দ্রুত যাওয়া যাবে উত্তরদিকে।

আপনি যদি এ-কথা বলেন, তবে আমার আর কিছু বলবার নেই।

শেষটায় বুনসবির আশঙ্কাই সত্যি হয়ে উঠলো। রাত আটটার সময় দক্ষিণদিক থেকে সাংঘাতিক ঝড় ছুটে এলো সমুদ্র উথালপাথাল করে। যেমন ভীষণ ঝড়, তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি। রাগে খেপে উঠলো সমুদ্র। প্রচণ্ড ঝড় তংকাদিরির ঝুঁটি ধরে নাড়াতে লাগলো। যেন দুরন্ত আক্রোশে একটা ক্রুদ্ধ বাঘ শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! রব উঠলো, শামাল, শামাল? কিন্তু আশ্চর্য বলতে হবে বুবির নৌকা-চালানোর দক্ষতা। এই সাংঘাতিক ঝড়ে তংকাদিরি এ-কাৎ ও-কাৎ হলো বটে, কিন্তু ডুবলো না, ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যে তীরের মতো ছুটে চললো সামনের দিকে।

ফিক্স আকাশের অবস্থা দেখে মনে-মনে ভাবছিলেন, কেন যে মরতে এই খ্যাপা দস্যুটার সঙ্গে এলাম! না-এলেই ভালো ছিলো! আউদা খুব ভয় পেলেও ফিলিয়াস ফগের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকে সাহস আনবার চেষ্টা করছিলেন। আর ফগ ভাবছিলেন, এমন না-হলে নৌকো এত দ্রুত যেতো কী করে! ঝড় তো আমার উপকারই করছে।

এতক্ষণ ঝড়ের বেগ ছিলো উত্তরদিকে, এবার হলো উত্তর-পশ্চিমে। ঝড়ের তাণ্ডব এত বেড়ে গেলো যে বুনবি অন্যান্য নাবিকের সঙ্গে পরামর্শ করে ফাকে জানালে : আমার মনে হয় কাছাকাছি কোনো বন্দরের দিকে না-গেলে সাংঘতিক বিপদ ঘটবে।

আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।

কোন বন্দরের দিকে যাবো তবে?

আমি তো শুধু একটাই চিনি।

সেটার নাম কী।

শাংহাই।

জবাব শুনে বুনসবি স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। তারপর বললে : বেশ। তা-ই হবে। আমরা শাংহাই বন্দরেই যাবো।

তংকাদিরি যেমন চলছিলো, তেমনি এগুতে লাগলো। রাত ঘন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো তুফান। এমন দুর্যোগ বোধহয় কেউ আরকখনও দ্যাখেনি! সমুদ্রের সে-কী আক্রোশ, সে-কী পাখসাট! তংকাদিরি যে কেন ডুবলো না, সে-ই আশ্চর্য!

তংকাদিরি দু-বার ডুবতে-ডুবতে বেঁচে গেলো বটে, কিন্তু নৌকোর মাস্তুল, ছাদ ইত্যাদি সবই উড়ে গেলো। সকালের দিকে হাওয়ার বেগ কিছু কমলো বটে, কিন্তু এবার হাওয়া বইতে লাগলো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। নৌকো প্রতিকূল হাওয়া কেটে চালানো বিষম কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। দুপুরবেলার দিকে কিন্তু আচমকা থেমে গেলো তুফান, আকাশ হলো অনাবিল নীল। বুনসবি শুধু হিশেব করে দেখলো শাংহাই তখনও প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। হাতে প্রায় ছ-ঘণ্টা সময় আছে। এই পঞ্চাশ মাইল ছ-ঘণ্টায় পেরুতে না-পারলে জাহাজ ধরা অসম্ভব। বুনসবি চিন্তিত হয়ে পড়লো।

এদিকে সমুদ্র তখন নিস্তরঙ্গ। হাওয়ার কোনো চিহ্নই নেই। পালে আর হাওয়া লাগে। শাংহাই তখনও পঁয়তাল্লিশ মাইল দুরে, আর হাতে মাত্র পাঁচঘণ্টা সময়!

হাওয়া, হাওয়া—একটু হাওয়া! কাল এত ঝড় বয়েছিলো, হাওয়া ছিলো তীব্রতম, আজ আর কি তার এককণাও থাকতে নেই। তংকাদিরির গতি হলো অত্যন্ত শ্লথ। ফিলিয়াস ফগের যথাসর্বস্ব নির্ভর করছে তংকাদিরির উপর। কিন্তু ফগ নির্বিকারভাবে চুপ করে বসে রইলেন।

দেখতে-দেখতে বাজলো সন্ধ্যা ছ-টা। সূর্য ডুবলো দিগন্তের সমুদ্রে। শাংহাই তখনও তিন মাইলের পথ। বুনসবি আর্তনাদ করে উঠলো, আর হলো না! পুরস্কার পেয়েও হারালুম! কাতর চোখে সে তাকালে ফগের দিকে। ফগ নিরুদ্বেগ নির্বিকার চোখে বুনসবির দিকে তাকালেন।

অনতিদূরে দেখা গেলো একটা জাহাজের চোঙ-ভলকে-ভলকে ধোঁয়া উঠছে সেই চোঙ দিয়ে। জাহাজ দেখেই চিনতে পারলো বুনবি। আমেরিকাগামী জাহাজ। সে রোষেক্ষোভে বলে উঠলো : জাহাজ অথৈ জলে ডুবে যাক!

ফগ শান্তগলায় বললেন : সংকেত করে সাহায্য চেয়ে জাহাজ ডাকো।

কুয়াশার মধ্যে সংকেত করবার জন্যে তংকাদিরিতে পেতলের-যে কামানটা ছিলো, ক্ষিপ্রহাতে বারুদ ঢেলে তার নল ভরে তুললো বুনসবি। মাস্তুলে বিপদজ্ঞাপক সাংকেতিক নিশান তুলে বারুদে আগুন দিলে সে।

তংকাদিরির ছোট্ট পেতলের কামান সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ শান্তিকে ভেঙেচুরে গর্জন করে উঠলো।

৯. ইয়োকোহামার জাপানি সার্কাস

সাতুই নভেম্বর হংকং ছেড়েছিলো কর্নাটিক। ফিলিয়াস ফগ যে-তিনটে ক্যাবিন ভাড়া নিয়েছিলেন, তার দুটো খালিই গেলো। আট তারিখের ভোরবেলা কনাটিকের নাবিকেরা দেখেছিলো, অসংযত-বেশ একজন আরোহী ডেকের উপর হতবুদ্ধি হয়ে কেমন জবুথবু বসে আছে। লোকটি আর-কেউ নয়, আমাদের জাঁ পাসপার্তু!

কর্নাটিক যেদিন হংকং ছাড়লো, সেদিন তো পাসপার্তু হংকং-এর এক চখানায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলো, তবে জাহাজে এলো কী করে? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আবার আমাদের সেদিনকার রাত্তিরবেলার সেই চখানায় ফিরে যেতে হবে।

ফিক্স তো পাসপার্তুকে অচেতন করে রেখে প্রস্থান করলেন। তারপরই চণ্ডুখানায় দুজন ওয়েটার এসে তাকে মেঝে থেকে তুলে ঐ ক্যাম্পখাটে শুইয়ে দিলে; তিন ঘণ্টা পরে সামান্য একটু জ্ঞান ফিরলো তার। তখন তার আর কিছুই মনে পড়লো না, শুধু মনে পড়লো কর্নাটিক। তখন প্রায় সন্ধে হয়েছে। পাসপার্তু টলতে-টলতে দেয়াল ধরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালে, তারপর যেন স্বপ্নের ঘোরে কর্নাটিক, কর্নাটিক বলে চীৎকার করতে-করতে চললো জেটির দিকে। জেটি বেশি দূরে ছিলো না। পাসপার্তু টলতে-টলতে কর্নাটিকের ডেকে গিয়ে উঠলো, আর কর্নাটিক, কনাটিকবলে বার-বার চেঁচিয়ে উঠেই আবার অচেতন হয়ে পড়ে গেলো। হংকংএর যাত্রীদের মধ্যে এ-রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটতো বলে নাবিকেরা খুব অবাক হলো না, অচেতন পাসপার্তুকে ডেক থেকে তুলে একটা ক্যাবিনের মধ্যে রেখে এলো।

ভোরবেলা সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ার ধীরে-ধীরে প্রকৃতিস্থ হলো পাসপার্তু। মনে পড়লো সব-কিছু। ভাবলে, আমি এমন মাতাল হয়েছিলুম শুনলে আমার প্রভু ফিলিয়াস ফগ কী বলবেন! যা-হোক, জাহাজে যে উঠতে পেরেছি এই ঢের! ডিটেকটিভ ফিক্স নিশ্চয়ই এখানে আসতে সাহস করেনি। কী আশ্চর্য! ফগের মতো লোককেও দস্যু বলে সন্দেহ করে পেছনে টিকটিকি লেগেছে! এ-কথা কি এখুনি ফগকে খুলে বলবো?, এখন থাক, ডিকেকটিভ ফি আগে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে সারা দুনিয়া চরকি ঘুরুক, তারপর লণ্ডনে গিয়ে তাকে নিয়ে বেশ-একটা মজা করা যাবে। এখন আর ফগকে বলা হবে না যে তার পেছনে ফেউ লেগেছে।

মন ঠিক করে পাসপার্তু ফগের কাছে মাপ চাইবার জন্যে তার কামরার সন্ধানে চললো। সারা জাহাজ আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও যখন ফগের দেখা পাওয়া গেলো না, তখন সে ভাবলে নেশার ঝোকে সে নিশ্চয়ই অন্যকোনো জাহাজে এসে উঠেছে, এ নিশ্চয়ই কনাটিক নয়। সে একটি নাবিককে শুধোলে : এটাই তো কর্নাটিক? ইয়োকোহামা যাচ্ছে?

নাবিকটি বললে : হ্যাঁ।

তখন হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো, জাহাজ ছাড়বার সময় যে আচমকা বদলে গিয়েছিলো, সে-খবর তো ফগকে জানানো হয়নি! অনুশোচনায় ভরে উঠলো তার মন। তার জন্যেই আজ সর্বনাশ হলো ফগের! তার জন্যেই ফগ আজ সর্বস্বান্ত, পুলিশের হাতে আটক হয়ে হয়তো-বা জেলেই পচে মরবেন! পরক্ষণেই ফিক্সের উপর ভয়ানক চটে উঠলো সে। কাছে পেলে তখন হয়তো ফিক্সকে ছিড়েই ফেলতো পাসপার্তু।

মদের নেশার মতো রাগও ক্রমশ একসময় অন্তর্হিত হলো তার। এবার নিজের অবস্থার কথা ভাবতে লাগলো সে। আগেই টিকিট করা হয়ে গিয়েছিলো বলে ইয়োকোহামা পর্যন্ত তার আর জাহাজ-ভাড়া লাগবে না, খাওয়া-দাওয়ারও ত্রুটি ঘটবে না। কিন্তু তারপর? তার কাছে যে একটা পয়সাও নেই! পাসপার্তু আর বেশি ভাবতে পারলে না।

ঠিক সময়েই ইয়োকোহামা পৌঁছুলো কর্নাটিক। পাসপার্তুকে আজ জাহাজ থেকে তো নামতেই হবে, তারপর সারাদিন খাওয়া জুটবে কি না কে জানে? জাহাজেই তাই ঠেশে খেয়ে নিয়ে তীরে নামলে সে। নেমেই দেখতে পেলে, সামনে সুদূরবিস্তৃত রাজপথ, লোকের ভিড়ে গমগম করছে। লক্ষ্যহীন পাসপার্তু রাজপথ ধরে এগুলো সামনে।

সে ঠিক করলে, নেহাৎ যদি অন্যকোনো উপায় না-হয়, তাহলে ইংরেজ কিংবা ফরাশি কন্সলের কাছে নিজের অবস্থা জানাবে। তারা হয়তো কোনো-একটা উপায় করে দেবেন। কিন্তু তার আগে একটিবার শেষ চেষ্টা করে দেখা উচিত।

ইয়োকোহামার সাহেব-পাড়া, জাপানিপাড়া পেরিয়ে বাজারে এসে হাজির হলো পাসপার্তু। হিরে-মুক্তোর দোকান, রোস্তোরাঁ, কাফে, দোকান-পশার কিছুরই অভাব নেই। চারদিক দেখতে-দেখতে সারাদিন ইতস্তত ঘুরে বেড়ালে সে। ক্রমশ সন্ধে হয়ে এলো। খিদেয় পেট জ্বলতে থাকলেও পয়সার অভাবে খাওয়া জুটলো না তার। পাসপার্তু এবার বুঝতে পারলে যে ঘর থেকে পা বাড়াতে হলে কিছু টাকা সঙ্গে না-রাখলে কিছুতেই চলে না।

অর্থহীন লক্ষ্যহীন পাসপার্তু জেটির দিকে এগুলো।

রাতটা তা কী করে কাটলো, পাসপার্তু নিজেই যে ভালো করে বুঝতে পারলে। ভোরবেলা সে দেখতে পেলে খিদে তাকে এতই দুর্বল ও ক্লান্ত করে ফেলেছে যে পেটে দানাপানি না-পড়লে আর চলে না। একটা পয়সাও নেই, এই অচেনা বিদেশ বিভুয়ে খাওয়াবে কে? তখনও ঘড়িটা ছিলো সঙ্গে, কিন্তু ঘড়িটা পার্সেপার্তুর এত প্রিয় ছিলো যে সে ঠিক করলে, বরং না-খেয়ে মরবে, কিন্তু তবু ঘড়িটা সে বিক্রি করবে না। ভেবে দেখলে, এই অবস্থায় পোশাক বদলালে বিশেষ-কোনো ক্ষতি হবে না, বরং পকেটে কিছু আসতে পারে।

পাসপার্তু পুরোনো পোশাকের দোকান খুঁজে বের করে নিজের পোশাকের বদলে একটি পুরোনো জাপানি পোশাক ও কিছু পয়সা পকেটে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। কাছের একটা হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে পাসপার্তু জাহাজ-ঘাটার দিকে এগুলো। ইচ্ছে, যদি আমেরিকা-গামী কোনো জাহাজে কাজ নিয়ে জাপান ছাড়তে পারে।

কিন্তু সুপারিশ ছাড়া এমনতর কোনো চাকরির সৌভাগ্য হয় না কারুই। সুপারিশ নেই বলে পাসপার্তুও কোথাও চাকরি পেলো না! হাল ছেড়ে দিয়ে যখন শহরে ফিরছে, তখন একটা প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন তার নজরে পড়লো।

সুবিখ্যাত উইলিয়ম বাটুলকারের জাপানি সার্কাসপার্টি!
আমেরিকা যাওয়ার আগে শেষ রজনী।
আশ্চর্য নাকের কসরৎ!
দেখবার শেষ সুযোগ কেউ ছাড়বেন না!

বিজ্ঞাপন দেখে পাসপার্তু ভাবলে, এরা যখন আমেরিকা যাচ্ছে, তখন কোনোরকমে এদের দলে ভিড়তে পারলে সুবিধেই হবে। একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। পাসপার্তু তক্ষুনি সার্কাসপার্টির ঠিকানা জোগাড় করে উইলিয়াম বাটুলকারের কাছে গিয়ে হাজির হলো।

বাটুলকার যখন শুনলো যে পাসপার্তু তার সার্কাসের দলে চাকরি করতে চায়, তখন সোজাসুজি জানিয়ে দিলে যে তার যথেষ্ট লোক আছে, আর কোনো নতুন লোকের দরকার নেই। বেগতিক দেখে পাসপার্তু বললে : যদি আমি আপনাদের সঙ্গে আমেরিকা যেতে পারতুম, তবে বড় উপকার হতো।

বটুলকার শুধোলে : তুমি তো জাপানি নও বলেই মনে হচ্ছে, তবে এমন পোশাক পরেছো যে?

যার যেমন সাধ্যি, সে তেমনি পোশাক পরে।

বেড়ে বলেছে তো! তোমাকে দেখে তো ফরাশি বলেই মনে হচ্ছে।

আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন।

কেমন করে বিকট বিটকেল মুখভঙ্গি করতে হয় তা তাহলে তোমার ভালোই জানা আছে?

পাসপার্তু এ-কথা শুনে চটে উঠলো। কিন্তু নিরুপায় হয়ে বললে : ফরাশিরা যে মুখভঙ্গি করতে পারে এ-কথা কে না জানে? কিন্তু ইয়াংকিদের মতো অমন তাজ্জব মুখভঙ্গি করতে পারে না।

ঠিক বলেছো। তা দ্যাখো, তোমাকে আমার সার্কাসের দলে ক্লাউন করে রাখতে পারি। রাজি? আহা-হা, রাগ কোরো না। ফ্রানসের সার্কাসে তারা অন্য দেশের লোককে ভাঁড় সাজায়, ক্লাউন সাজায়। কিন্তু বিদেশে বেরুলে ফরাশিকেও ক্লাউন সাজতে হয়।

এখন তো তা-ই দেখতে পাচ্ছি।

গায়ে জোর আছে তো?

খেতে পেলেই আমার গায়ে জোর হয়।

গান গাইতে জানো?—জানো, বলছো? এ-গান কিন্তু যেমন-তেমন গান নয়—মাটিতে মাথা রেখে পা-দুটো উপরের দিকে তুলতে হবে; বাঁ-পায়ের তলায় ঘুরবে একটা লাটিম আর ডান পায়ে থাকবে একটা তলোয়ার-সেই অবস্থায় গান গাইতে হবে। পারবে?

ও-সব কায়দা-টায়দা কিছু-কিছু জানা আছে বৈকি!

ঠিক হ্যায়। এসব করতে রাজি থাকলে ঢুকে পড়ো আমার দলে।

তখুনি সার্কাসের দলে চাকরি নিলে পাসপার্তু। আশ্চর্য নাকের কসরৎ দেখবার জন্যে হুড়হুড় করে টিকিট বিক্রি হয়েছে, চারদিক লোকে-লোকারণ্য, মাঝে-মাঝে অর্কেস্ট্রা বাজছে-শিগগিরই সার্কাস শুরু হয়ে গেলো।

পৃথিবীর মধ্যে ভালো ম্যাজিশিয়ান ও সার্কাসওয়ালা বলে জাপানিদের বেশ সুনাম আছে। কিন্তু সেই জাপানিরাও রকম-বেরকম অদ্ভুত খেলা দেখে যখন বিস্ময়ে হতবাক, তখুনি আশ্চর্য নাকের কসরৎ শুরু হয়ে গেলো।

মধ্যযুগোচিত পোশাকে সেজে-গুজে ডানাওয়ালা জনাকয়েক সার্কাসের লোেক স্টেজে এসে দাঁড়ালে। তাদের বড়ো-বড়ো নাক স্টেজে এক অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি করলো : কারু আটহাত লম্বা নাক, কারু-বা চারহাত, কারু-বা পাঁচহাত। সেই নাকগুলোর মধ্যে আবার নানান রঙচঙ মাখানো। নাকগুলো বাঁশের তৈরি। কয়েকজন অদ্ভুত পেশাক-পরা। লোক এসে নাকওলাদের নাকের উপর লাফ-ঝাঁপ দিয়ে নানান রকম খেলা দেখাতে লাগলো।

আরো পঞ্চাশজন দীর্ঘনাসা লোক এসে হাজির হলো নাকের পিরামিড তৈরি করবার জন্যে। পাসপার্তু ছিলো এই দলে। এভাবে বেদম-দীর্ঘ কোনো নাক লাগাতে ইচ্ছে ছিলো

তার, কিন্তু গত্যন্তর না-দেখে রাজি হতে হয়েছিলো। সেই বিরাট নাক নিয়ে ক-জন স্টেজের উপর শুয়ে পড়লো—তাদের নাকের উপর শুলো আবার আরো কয়েকজন–এদের নাকের উপরও আবার আর-একদল শুলো। এভাবে সেই নাকের পিরামিড উঠতে লাগলো উঁচুতে। এ-ভাবে উঠতে-উঠতে পিরামিডের চুড়ো স্টেজের শামিয়ানা ছুঁলো।

দর্শকরা তো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ঘন-ঘন হাততালি দিতে লাগলো, আর সঙ্গেসঙ্গে তীব্র চনমনে শব্দে বেজে উঠলো অর্কেস্ট্রা।

হঠাৎ সবাই সচমকে তাকিয়ে দেখলে, সেই নাকের পিরামিড কেঁপে উঠছে। দেখা গেলো সব-নিচের দলের একজনের নাক গেলো খুলে। অমনি সেই পিরামিড ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো-সার্কাসের লোকরা কে কোথায় ছিটকে পড়লো কে জানে।

বিভ্রাটটা ঘটলো কিন্তু পাসপার্তুর দোষেই। হুড়মুড় করে সেই গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে কোনোরকমে বেরিয়ে এসে পাসপার্তু একলাফে ফুট-লাইট পেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে দর্শকদের মধ্যে একজনের পায়ের কাছে বসে পড়লো। রুদ্ধস্বরে বললে : মাপ করুন, মাপ করুন আমায়!

এ কী, পাসপার্তু যে!

হ্যাঁ, আমি।

যাও, এখুনি জাহাজে গিয়ে ওঠো।

পাসপার্তু তখনই ফিলিয়াস ফগ ও আউদার সঙ্গে থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

ফটকের কাছেই দাঁড়িয়েছিলো সার্কাসের মালিক বাটুলকার। রাগে, আক্রোশে ফুশছিলো সে! এভাবে পিরামিড ভেঙে দেবার জন্যে পাসপার্তুকে আটকে তার কাছে ক্ষতিপূরণ চাইলে সে। ফিলিয়াস ফগ দ্বিরুক্তি না-করে বাটুলকারের সামনে একতাড়া নোট ফেলে

তখুনি সেখান থেকে বেরিয়ে আমেরিকাগামী ডাক-জাহাজ এস. এস. জেনারেল গ্রান্টে গিয়ে উঠলেন।

...শাংহাই বন্দরে কী ঘটেছিলো পাঠক নিঃসন্দেহে তা সহজেই অনুমান করতে পেরেছেন। তংকাদিরির কামানের শব্দ শুনে ডাকজাহাজ তার কাছে এসেছিলো, অমনি ফিলিয়াস ফগ আউদা ও ফিকে নিয়ে ডাক-জাহাজে ওঠেন, আর চোদ্দই নভেম্বর পৌঁছোন ইয়োকোহামা।

ইয়োকোহামায় পৌঁছেই কর্নাটিক জাহাজে খবর নিয়ে শোনা গেলো, জাঁ পাসপার্তু বলে এক ফরাশি সেই জাহাজেই ইয়োকোহামা এসেছে। সেদিন রাত্রেই ফগের সানফ্রান্সিসকো রওনা হওয়ার কথা। ফগ ইয়োকোহামার কন্সাল আপিশে গিয়ে পাসপার্তুর খোঁজ নিলেন। হঠাৎ-যদি দেখা হয়ে যায়, সে-জন্যে অনেক ঘুরলেন শহরের রাস্তায়রাস্তায়। অনেক খোঁজ করেও যখন তার কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না, এখন জাহাজে ফেরবার পথে সার্কাসের তাঁবুর সামনে গিশগিশে ভিড় দেখে সার্কাস দেখতে ভিতরে ঢুকলেন। পাসপার্তু যে সার্কাসের দলে ভিড়ে বসতে পারে ফগ স্বপ্নেও তা ভাবেননি।

তারপর খেলা দেখতে-দেখতে অদূরে দর্শকদের মধ্যে ফগ ও আউদাকে দেখে পাসপার্তু চঞ্চল হয়ে উঠে কী-কাণ্ডই যে করে বসলো, তা পাঠক আগেই জেনেছেন।...

...আউদার কাছ থেকে ফগের সমুদ্র পাড়ির কাহিনী শুনলো পাসপার্তু। আরো শুনলো যে, ফিক নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোকও ফগের সঙ্গে তংকাদিরিতে চেপে ইয়োকোহামা এসেছেন। ফিক্সের নাম শুনে বিন্দুমাত্র চঞ্চল হলো না পাসপার্তু। ভাবলে, যথাসময়ে

একবার বাগে পেলে ফিক্সকে সে উচিতশিক্ষা দেবে, আর তখনই তার ভিতরের কথা ফাস করে দেবে। নিজের কথা বলবার সময় সে সব গোপন করে গিয়ে বললে যে, চণ্ডু খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলো বলেই তার এত দুর্দশা ঘটেছে। ফগ সব দেখেশুনে তাকে জামা-কাপড় কেনবার জন্যে কিছু টাকা দিয়ে দিলেন।

বলা বাহুল্য, ফিক্সও জেনারেল গ্রান্ট জাহাজে ছিলেন। ইয়োকোহামা পৌঁছেই তিনি দেখতে পেলেন তার সেই প্রত্যাশিত ওয়ারেন্ট বিলেত থেকে এসেছে। কিন্তু তার জোরে ফগকে ধরবার কোনো উপায়ই ছিলো না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক্তিয়ারের বাইরে আসামীকে ধরতে হলে স্পেশ্যাল ওয়ারেন্টের দরকার—কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা করবার সময়ও তখন আর ছিলো না। কি ভাবলেন, যা-হোক, ওয়ারেন্ট তো পাওয়া গেলো—এখানে আর ওকে পাকড়ানো গেলো না বটে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে যাওয়ামাত্রই ধরবো। তখন তাকে কে বাঁচাতে পারে দেখবো। এখন ফগ যাতে শিগগির বিলেত পৌঁছুতে পারে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। এমনি সময় পাসপার্তুকে দেখতে পেয়ে বিষম ভয় পেয়ে নিজের ক্যাবিনে প্রস্থান করলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই রাত্রিতেই তাঁকে পাসপার্তুর কাছে এনে হাজির করলে।

তাকে দেখেই পাসপার্তুর মাথায় খুন চেপে গেলো। কোনো কথা না-বলে পাসপার্তু স্টান তাকে অনেকগুলো ঘুসি কষিয়ে দিলে। ফিক্স জাহাজের ডেকের উপর ছিটকে পড়লেন। নাবিক ও যাত্রীদের মধ্যে অনেক চারদিকে দাঁড়িয়ে হো-হো করে হাসতে লাগলো। ফিক্স তখন কাতর কণ্ঠে বললেন : আর কেন, পাসপার্তু, ঢের হয়েছে।

তখন পাসপার্তু তাকে ছেড়ে দিয়ে বললে : হ্যাঁ, আপাতত যৎকিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম হয়েছে বটে!

এসো তবে, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ফিক্স বললেন, আমি এখন যা বলবো তা ফিসিয়াস রে ভালোর জন্যেই।

জাহাজের এককোণে পাসপার্তুকে ডেকে নিয়ে ফিক্স বলতে লাগলেন : তুমি আমার উপর একহাত নিয়ে নিয়েছে, বেশ করেছে। এমনধারা যে হবে, তা আমার জানাই ছিলো। গোয়েন্দাদের কাজই এমন যে সময়-অসময়ে বেধড়ক মার খেতে হয়। কিন্তু আমার কথাগুলো একবার মন দিয়ে শোনো। এতদিন পর্যন্ত আমি ওঁর বিপক্ষে ছিলুম কিন্তু এখন থেকে ওঁর প্রাণের বন্ধু—যদিও আমার এখনও দৃঢ়বিশ্বাস যে উনিই দস্যু। আরে, অত উত্তেজিত হয়ে উঠো না। যা বলি, শোনো। যতদিন ফগ ব্রিটিশ এলাকায় ছিলেন, ততদিন আমি ওঁকে অ্যারেস্ট করতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখানে ওঁকে কোনোরকমেই গ্রেপ্তার করতে পারবো না। মনে হচ্ছে, ফগ এখন বিলেতে ফিরবেন। আমিও ফেউয়ের মতো তার অনুসরণ করবে। তিনি যাতে নির্বিঘ্নে বিলেতে যেতে পারেন, আমাকে এখন সে-চেষ্টাই করতে হবে। বিলেতেই জানা যাবে ফগ দোষী কি নির্দোষ। ততদিন তোমার মতো আমিও তার শুভাকাঙ্ক্ষী।

ফিক্স এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে পাসপার্তুর কতকটা বিশ্বাস হলো।

ফিক্স শুধোলেন : কেমন? তবে আমরা আজ থেকে বন্ধু।

বন্ধু? ককখনো না। চেঁচিয়ে উঠলো পাসপার্তু। তবে আমরা দুজনেই আজ থেকে ফগের শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এ-কথা মনে রাখবেন, যে-মুহূর্তে দেখবো আপনি তার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছেন, সেই মুহূর্তেই আপনাকে আমি ছিঁড়ে ফেলবো! এ-কথা যেন মনে থাকে।

তা-ই হবে-বলে ফিক্স বিদায় নিয়ে নিজের ক্যাবিনে ফিরে গেলেন।

এস, এস, জেনারেল গ্রান্ট খুবই দ্রুতগামী জাহাজ ছিলো। ফগ হিশেব করে দেখলেন যে, তিনি দোসরা ডিসেম্বর সান-ফ্রান্সিসকো, এগারোই নিউইয়র্ক, আর বিশ তারিখে লণ্ডন পৌঁছুতে পারবেন।

অবহাওয়া চমৎকার ছিলো বলে জেনারেল গ্রান্ট দ্রুতবেগে সান-ফ্রান্সিসকোর দিকে এগিয়ে চললো। বলবার মতো বিশেষ কিছুই জাহাজে ঘটলো না। যা-কিছু ঘটছিলো, তা সবই ঘটছিলো আউদার মনে।

ক্রমশই ফগের দিকে আউদার হৃদয় আকৃষ্ট হচ্ছিলো। সে আকর্ষণের কারণ শুধু কৃতজ্ঞতা বলে নির্দেশ করলে অবশ্য মস্ত ভুল করা হবে।

১০. ইয়্যাংকিদের হালচাল

যথাসময়ে জেনারেল গ্রান্ট সানফ্রান্সিসকোয় এসে নোঙর ফেললো। তখন সকাল। ফগ আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করেই শুনলেন নিউইয়র্কের ট্রেন সন্ধ্যার সময় ছাড়বে। তারা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেলটায় কোনো জিনিশেরই অভাব ছিলো না। প্রাতরাশের পর ফিলিয়াস ফগ আউদাকে নিয়ে ইংরেজ কন্সলের আপিশে গেলেন পাসপোর্টে সই করিয়ে নিতে।

পাসপার্তু বললে : শুনেছি আমেরিকার রেলপথে ঠগ-জোচ্চোর দস্যু-ডাকাতের বড়ো ভয়। তারা চলতি ট্রেনে উঠেই লুঠতরাজ করে। গোটাকতক রিভলভার কিনে নিলে হয় না?

ফগ বললেন : ইচ্ছে হয় তো কিনতে পারো। তবে পথে হয়তো সে-সবের কোনো দরকারই হবে না।

রাস্তায় হঠাৎ ফগের সঙ্গে ফিক্সের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো। তাকে দেখেই ফগ বললেন : আশ্চর্য! আমরা এক জাহাজেই এসেছি, অথচ আপনার সঙ্গে জাহাজে একবারও দেখা হয়নি!

ফিক্স আগের কথা উল্লেখ করে ফগকে যারপরনেই কৃতজ্ঞতা জানালেন। বললেন : আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করা রীতিমতো সৌভাগ্যের কথা। আমিও কাজের খাতিরে ইওরোপেই যাচ্ছি। আপনার আপত্তি না-থাকলে আমরা বাকি রাস্তাটা একসঙ্গেই যেতে পারি।

সে-কী কথা! আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করা তো আমারই সৌভাগ্যের বিষয়। বেশতো, আমরা না-হয় একসঙ্গেই ইওরোপ যাবো।

ফিক্সের মৎসব সিদ্ধ হলো।

মানগোমারি টি দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা। সামনেই দেখলেন লোকে লোকারণ্য। সেই জনারণ্য ভেদ করে সামনে এগুনো অসম্ভব। সেখানে কেউ-বা চীৎকার করছে, কেউবা বড়ো-বড়ো পোস্টার নিয়ে ছুটোছুটি করছে, কোথাও উড়ছে ঝাণ্ডা, কোথাও-বা অনেকে চেঁচিয়ে উঠছে, ক্যামেরফি জিন্দাবাদ, কেউ-বা বলছে, মভিবয় জিন্দাবাদ।

ফিক্সের মনে হলো এ নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক সভা। তাই তিনি বললেন : আসুন, আমরা চটপট এখান থেকে সরে পড়ি। এখানে দাঁড়ালে বিপদ ঘটতে পারে। ইয়াংকিদের কোনো বিশ্বাস নেই।

ফগও সায় দিলেন তার কথায়। কিন্তু তখন অন্যদিকে যাওয়ার আর-কোনো উপায় ছিলো না। রাস্তার এককিনারে সরে এসে তারা সেখান থেকে কেটে পড়বার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। চারদিক দেখে-শুনে ফগ ভাবলেন, হয়তো আমেরিকার ন্যাশনাল কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচন, নয়তো কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা মনোনয়নের জন্যেই এই সভা ডাকা হয়েছে।

ক্রমশই কোলাহল বেড়ে উঠছিলো বটে, কিন্তু হঠাৎ যে ধুমধাড়াক্কা দাঙ্গা শুরু হয়ে যেতে পারে কেউই সে-কথা ভাবতে পারেননি। দেখতে-দেখতে সেই জনারণ্যের কোলাহল গেলো বেড়ে, শুরু হলো ঘুসোঘুসি, লাঠালাঠি। রিভলভারের শব্দও কানে এলো। দাঙ্গা

ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করলো দেখে তারা সরে পড়বার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় এক সবলদেহ ইয়াংকি ফগের মাথা লক্ষ্য করে লাঠি ওঠালে। ফিক্স যদি নিজের দেহে সে আঘাত না-নিতেন, তাহলে হয়তো ফিলিয়াস ফগ সাংঘাতিক আহত হতেন। লাঠির ঘায়ে ফিক্সের টুপি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো।

অসহ্য ঘৃণায় ফেটে পড়লেন ফিলিয়াস ফগ : কী নীচ এই ইয়াংকিটা!

লাল দাড়িতে হাত বুলিয়ে তাগড়াই সেই মার্কিন বললে : ওরে ইংরেজ, মনে থাকে যেন আবার আমাদের দেখা হবে!

ঠিক হ্যায়! যখন-ইচ্ছে তখনই তোমার সঙ্গে মোলাকাত করতে রাজি।

তোমার নাম কী?

ফিলিয়াস ফগ। তোমার?

কর্নেল স্ট্যাম্প প্রক্টর।

উন্মাদ জনারণ্যের কোলাহলে ও ধাক্কাধাক্কিতে কর্নেল প্রক্টরের সঙ্গে ফগের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো তখনকার মতো।

কী করে যে আউদাকে নিয়ে ফগ আর ফিক্স হোটেলে জীবন্ত ফিরতে পারলেন, তা তারা নিজেরাই জানেন না। পোশাক-আশাকের যে-দুর্দশা হয়েছিলো তাতে হোটেলে ফিরে সকলকেই নতুন জামাকপড় কিনতে হলো।

পাসপার্তু আগেই বারোটা অটোমেটিক রিভলভার ও প্রচুর কার্তুজ নিয়ে হোটেলে ফিরেছিলো। ফিক্সকে দেখেই তার ভুরু কুঁচকে গেলো। কিন্তু সে যখন শুনলে যে তার জন্যেই ফগ আহত হতে-হতে বেঁচে গেছেন, তখন সে কথঞ্চিৎ শান্ত হলো। দেখলো যে ফিক্স ভঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করেছেন।

সান্ধ্যভোজন শেষ করে সবাই স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেনে উঠতে উঠতে ফগ বললেন : সেই ইয়াংকিটার সঙ্গে আর দেখা হলো না। ইংরেজকে অপমান করার প্রতিশোধ নিতে আবার একদিন তার খোঁজে আমাকে এই নচ্ছার দেশে আসতে হবে।

এ-কথা শুনে ফিক্স কিন্তু মনে-মনে হেসেই কুটিপাট! ভাবলেন, একবার ইংল্যাণ্ডে গেলে হয়, তারপর আর তোমাকে ফিরতে হবে না বাছাধন! আমি নইলে সঙ্গে আছি কেন?

স্টেশনের একটি লোককে দেখে ফগ শুধোলেন : আজ অত গোলমাল হলো কীসের?

একটা সভা হচ্ছিলো।

কোনো সেনাপতি মনোনীত হচ্ছিলেন বুঝি?

লোকটি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। না, না সেনাপতি নির্বাচন! ও কি আর যে-সে কথা! এ-সভায় একজন সাধারণ বিচারক মনোনীত হচ্ছিলেন।

আর-কোনো কথাই জিগেস করা গেলো না। ট্রেন ছেড়ে দিলো।

নিউইয়র্ক থেকে সান-ফ্রান্সিসকো পর্যন্ত রেল-লাইন তিন হাজার সাতশো ছিয়াশি মাইল লম্বা। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে একদা কম করেও ছ-মাস লাগতোসেই ছ-মাসের পথ এখন একহপ্তায় দাঁড়িয়েছে।

যে-ট্রেনে ফগরা উঠলেন, সেই ট্রেনে ড্রয়িং-রুম, স্মোকিং-রুম, খাবার-ঘর সবকিছুই ছিলো। চলতি ট্রেনেই এক-কামরা থেকে অন্য-কামরায় যাওয়া যেতো। বইপত্র, খাবার-দাবার কোনোকিছুরই অভাব ছিলো না ট্রেনে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছোট্ট প্রেসও ছিলো। সেই প্রেসে ছাপা হয়ে খবরের কাগজ পর্যন্ত বেরুতে। ট্রেনের সীটগুলো এমন কৌশলে তৈরি ছিলো যে, স্প্রিং টিপলেই তার পিছনের অংশ খুলে আসতো, বেরিয়ে পড়তো চমৎকার বিছানা—ধবধবে ও নরম। যে-গাড়িতে যতগুলো বিছানা, সেই গাড়িতে তার চেয়ে বেশি যাত্রী থাকবার নিয়ম ছিলো না।

কয়েক দিন ধরে নির্বিঘ্নেই ট্রেন চললো। সাতুই ডিসেম্বর ভোরবেলা গ্রীন-রিভার স্টেশনে এসে ট্রেন থামলো। গত রাতে প্রচুর বরফ পড়েছিলো, তার জের সকালবেলাতেও কাটেনি। পাসপার্তু ঠাণ্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে ভাবছিলো, এ-সময়েও লোকে দেশ-ভ্রমণে বেরোয়! আর-একটু বরফ পড়লেই তো ট্রেন আর চলতে পারতো না।

ট্রেন থামবার সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই নামলো। হঠাৎ আউদা এক ভদ্রলোককে দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠলেন। ভদ্রলোক আর-কেউ নন—সেই কর্নেল প্রক্টর, যিনি আবার দেখা হবে বলে ফিলিয়াস ফগকে শাসিয়েছিলেন। ফগ তখনও ঘুমোচ্ছিলেন। কর্নেলকে দেখে বিপদের আশঙ্কায় আউদার মন এতই বিচলিত হয়ে পড়লো যে তিনি ফিক্স আর পাসপার্তুকে কর্নেলের কথা খুলে বললেন।

ফিক্স বললেন : কোনো ভয় নেই আপনার, কিছু ভাববেন না। কর্নেলকে সবআগে আমার সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে হবে। আমিই তো তার হাতে বেশি অপমানিত হয়েছি।

পাসপার্তুও দাঁত কিড়মিড় করে বললে : ও-সব কর্নেল-টর্নেলকে থোড়াই কেয়ার করি আমি। আমার সঙ্গেও তার অল্প-বিস্তর হিশেব-নিকেশ আছে।

এদের এইসব তড়পানি শুনেও শান্ত হতে পারলেন না আউদা। বললেন : মিস্টার ফিক্স, আপনি কি জানেন না যে মিস্টার ফগ কিছুতেই তাঁর নিজের দায় বা কলহ অন্যকারু ঘাড়ে নিতে দেবেন না। তিনিই তো বলেছেন যে তাকে অপমান করেছে তার সঙ্গে বোঝাঁপড়া করবার জন্যে আবার আমেরিকায় আসবেন। তার সঙ্গে কর্নেলের যদি এখনই দেখা হয়, না-জানি কী-একটা বিষম কাণ্ড ঘটবে। দুজনের মধ্যে যাতে দেখা না-হয়, আপনারা বরং তারই ব্যবস্থা করুন। না-হলে অনর্থ হবে!

ফিক্স বললেন : আপনার কথাই ঠিক। দেখা হলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে। মিস্টার ফগ বাজি জিততে পারুন আর না-পারুন, তার দেরি হলে—

ইশারায় তাকে চুপ করতে বলে পাসপার্তু বললে : তার দেরি হলে রিফর্ম ক্লাবের একটা মস্ত সুবিধে জুটে গেলো আর-কি! নিউইয়র্ক যেতে এখনও আমাদের চারদিন বাকি। যদি মিস্টার ফগ এর মধ্যে গাড়ি থেকে না-নামেন, তাহলেই কর্নেলের সঙ্গে তার আর দেখা হবে না। যে-করেই হোক, তাদের যাতে দেখা না-হয়, সে ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে।

এমন সময় ফগের ঘুম ভাঙলো দেখে সবাই চুপ করে গেলেন। শুধু ফিক্স নিচুগলায় পাসপার্তুকে বললেন : মিস্টার ফগকে জিয়ন্ত বিলেতে নিয়ে যেতে যা-কিছু করা সম্ভব, আমি তা-ই করবো।

ফগ যাতে গাড়ি থেকে না-নামেন তারই ব্যবস্থা করবার জন্যে ফিক্স তাকে বললেন : সময় যেন আর কাটতেই চায় না। একটু হুইস্ট খেললে মন্দ হতো না।

ফগ বললেন : খেলার সঙ্গী আর তাশ পাওয়া গেলে সত্যিই বেশ হতো।

তাশ তো এখুনি আনতে পারা যায়। ট্রেনেই কিনতে পাওয়া যাবে। আর খেলার সঙ্গী? যদি মিসেস আউদা খেলেন

আউলা বললেন : আমি অল্পস্বল্প জানি।

আমিও একটু খেলতে পারি।

ফগ খুশি হয়ে বললেন : বেশ-তো।

পাসপার্তু তক্ষুনি গিয়ে কয়েক প্যাকেট তাশ কিনে আনলো।

ট্রেন নির্বিবাদে এগিয়ে চলো। ফগ নিশ্চিন্ত মনে হুইস্ট খেলতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফগ খেলায় এত জমে গেলেন যে, পথের মধ্যে হঠাৎ–যখন ট্রেন থেমে গেলো, সেদিকে খেয়ালও করলেন না।

হাতে কোনো কাজ ছিলো না বলে পথের মধ্যে হঠাৎ কেন ট্রেন থেমে গেলো, সে-খবর নেবার জন্যে পাসপার্তু গাড়ি থেকে নামলে। অনেকেই ট্রেনের গার্ডকে ঘিরে ধরে নানান প্রশ্ন করছিলো। কর্নেল প্রক্টরও ছিলেন এদের মধ্যে।

মেডিসিন-বো স্টেশনের স্টেশন মাস্টার একটি লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছিলেন যে, সামনের একটা সেতু নিরাপদ নয়, কী-রকম যেন নড়বোড়ে হয়ে আছে; তার উপর দিয়ে ট্রেন চলতে পারবে না। গার্ড বললে যে, এই খবর পেয়েই সে গাড়ি থামিয়েছে। ট্রেনটা যেখানে থেমেছিলো, তার মাইল-খানেক দূরে ছিলো ব্রিজটা। ব্রিজটার তলা দিয়ে একটা পাহাড়ি নদী তীব্রবেগে ছুটে চলেছিলো। জানা গেলো, ব্রিজটার কয়েকটা বীম ভেঙে গেছে বলেই অমন নড়বোড়ে হয়ে আছে।

খবর শুনে পাসপার্তুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। ফগকে এই দুঃসংবাদ দেয়ার সাহস আর তার হলো না। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে সে আরোহীদের আলোচনা শুনতে লাগলো।

কর্নেল প্রক্টর বললেন : বাঃ! বেড়ে মজা দেখছি! আমরা কি তবে এই বরফের মধ্যে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি?

গার্ড জবাব দিলে : না, আমি আরেকটা ট্রেনের জন্যে ওমাহা স্টেশনে তার পাঠিয়েছি। কিন্তু ছ-ঘণ্টার আছে সে-গাড়ি মেডিসিন-বো স্টেশনে আসতে পারবে না। এদিকে একমাইল পথ হলেও ছ-ঘণ্টার আগে হেঁটেও যাওয়া যাবে না। নদী পার হতে হবে তো। নৌকোয় পার হওয়া এখন অসম্ভব। পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। নদী এত ফুসে উঠেছে যে

নৌকোর সাধ্যি নেই সাঁকোর কাছে নদী পার হয়। পার হবার একটাই ঘাট আছে। সে আবার দশমাইল দূরে।

যাত্রীদের মধ্যে তখন একটা বিষম শোরগোল উঠলো। ফগ যদি খেলায় মেতে–থাকতেন, তবে তিনিও নিশ্চয়ই গাড়ি থেকে নেমে খবর নিতেন এত হৈ-চৈ কীসের।

ড্রাইভার তখন বললে : একটা উপায় অবিশ্যি আছে—একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়। হ্যাঁ, সাঁকো পেরুবার কথাই বলছি।

ট্রেনখানা সমেত নাকি?

হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি।

গার্ড বললে : পাগল হয়েছে? সাঁকো যে ভেঙে গেছে!

তা ভাঙলোই বা, পড়ে তো আর যায়নি। গোটা-দুই থাম ভেঙেছে মাত্র। আমি যদি খুব স্পীডে গাড়ি চালিয়ে দিই, তবে পলক ফেলতে-না-ফেলতে ট্রেন নিয়েই সাঁকো পেরিয়ে যেতে পারবো।

ড্রাইভারের কথা শুনে তো পাসপার্তুর আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া। কিন্তু কথাটা অনেকেরই মনে ধরলো।

কর্নেল প্রক্টর বললেন : এ আর বেশি কথা কী। এ-তো হতেই পারে। এখানে তো তবু সাঁকোটা দাঁড়িয়ে আছে, ভেঙে পড়েনি। আমি এক ড্রাইভারকে জানি, যে বিনা সাঁকোতেই

একবার একটা ছোটো নদী পার করে ট্রেন নিয়ে গিয়েছিলো। সে তখন কী সাংঘাতিক স্পীডেই যে গাড়ি চালিয়েছিলো, তা আর বলা যায় না। গোটা ট্রেনখানা লাইন থেকে যেন লাফিয়ে উঠে নদী পেরিয়ে গেলো। আমাদের ট্রেন তো তবু সাঁকোর উপর দিয়েই যাবে।

এ-কথা শুনে অনেকেই ড্রাইভারের পক্ষ সমর্থন করলো। একজন বললে : আমরা যে নির্বিঘ্নে যেতে পারবো, তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা।

আর-একজন অমনি বলে উঠলো : পঞ্চাশ ভাগ কী–হে-ষাট ভাগ।

কর্নেল প্রক্টর বললেন : তোমাদের কোনো আন্দাজ নেই! যেখানে আশি-নব্বই ভাগ সম্ভাবনা সেখানে ষাট ভাগ বলছো।

ইয়াংকিদের হালচাল দেখে পাসপার্তুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। এমন সময় একটু-নিরাপদ একটা উপায় তার মনে এলো। সে বললো : আমি বলছিলাম কী এই বিপজ্জনক–

তার কথা কেড়ে নিয়ে একটি লোক বললে : পার হবার আশি ভাগ সম্ভাবনা যেখানে দেখা গেলো, তা আবার বিপজ্জনক কী–হে? ড্রাইভার নিজেই তো বলছে যে সে যেতে পারবে।

তা পারতে পারে। কিন্তু আমি যা বলছিলুম সেইটেই বোধহয় ঠিক হতো।

ঠিক! কর্নেল প্রক্টর রেগে উঠলেন। ঠিক আবার কী! তুমি কি বুঝতে পারছো না যে আমরা ফুল-স্পীডে চালিয়ে যাবো? শুনলে? ফুল-স্পীডে। তারপর বিদ্রূপে ফেটে পড়লেন—

কী-হে ছোকরা, ভয় পেয়েছে নাকি?

ভয়? ভয় কাকে বলে পাসপার্তু জানে না!

গার্ড বললে : উঠুন, উঠুন-সবাই গাড়িতে উঠুন। গাড়ি এখুনি ছাড়বে।

পাসপার্তু নিচুগলায় বললে : তা না-হয় উঠছি। কিন্তু যাত্রীরা হেঁটে সাঁকো পেরুলে পর গাড়িটা সাঁকোর উপর তুললে ভালো হতো। কিন্তু তার যুক্তি কেউ শুনতেই চাইলো না– শুনলেও মানতে চাইতো কি না সন্দেহ।

সবাই গাড়িতে গিয়ে উঠলো। ফগ তখনও একমনে হুইস্ট খেলছিলেন। ড্রাইভার সিটি দিয়ে ট্রেনখানি একমাইল পেছনে নিয়ে গেলো। সেখান থেকে এগুলো প্রচণ্ড বেগে, ঝড়ের বেগে। ঘণ্টায় একশো মাইলের কম হবে না সে-স্পীড। ট্রেন যেন রেললাইন না-ছুঁয়েই ছুটলো।

বিদ্যুৎ যেমন করে চক্ষের পলকে আকাশের একপান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত স্পর্শ করে, ট্রেনটাও তেমনি নিমেষের মধ্যে সাঁকো পেরিয়ে গেলো। সবাই তাকিয়ে দেখলো, সাঁকোটা টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ে যাচ্ছে নদীতে।

ট্রেন এগিয়ে চললো।...

ট্রেনে তিনদিন তিনরাত কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে তেরোশো বিরাশি মাইল পেরিয়ে এসেছে ট্রেন। ইভান্স-পাস স্টেশন ছাড়িয়ে সন্ধের পর ট্রেন ক্রমশ নিচের দিকে ছুটে চললো।...

সকালবেলা ফগ হুইস্ট খেলতে শুরু করলেন। ফিক্সও হুইস্টে রীতিমতো ওস্তাদ। অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলা জমে উঠলো। সেবার ফগের পালা। যেই ফগ একটা চিড়েতন খেলতে যাবেন, অমনি কে যেন পিছন থেকে বলে উঠলো : আমি হলে হরতন খেলতুম। সবাই চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখলো, পিছনে কর্নেল প্রক্টর। ফগকে দেখেই কর্নেল বললেন : ও আপনিই আমার সেই পুরোনো ইংরেজ-বন্ধু। তা-ই তো বলি, ইংরেজ না-হলে গর্দভের মতো চিড়েতন খেলে কে?

ঠিক তা-ই। দেখুন-না, আমিও খেলছি তা-ই। ফগ তাঁশ দিলেন।

তাশটা তুলে নেয়ার চেষ্টা করতে-করতে দুঃসহ স্পর্ধায় কর্নেল বললেন : আমি হরতন খেলতে চাই। আপনি হুইস্ট খেলার কিছুই জানেন না দেখছি।

ফগ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অন্যেও যেমন জানে, আমিও তেমনি জানি।

বিদ্রূপে ফেটে পড়লেন কর্নেল।বেশ-তো। একহাত হয়ে যাক না!

ব্যাপার দেখে আউদার মুখ পাঁশুটে হয়ে গেলো। ফগের হাত ধরে তাকে টেনে বসালেন আউদা। পাসপার্তু রাগে যেভাবে ফুসে উঠলো, তাতে মনে হলো সে বুঝি এক্ষুনি কর্নেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে!

ফগকে লক্ষ্য করে ফিক্স কিন্তু তক্ষুনি বললেন : আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে এঁর সঙ্গে আমাকেই আগে হিশেব-নিকেশ করতে হবে–

ফগ শান্তগলায় বললেন : মাপ করবেন, বোঝাঁপড়াটা আগে আমার সঙ্গেই হবে। কী করে হুইস্ট খেলতে হয় তা আমি জানিনে, এ-কথা বলে কর্নেল আমাকে অত্যন্ত অপমানিত করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই তার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেবেন।

তীব্র কণ্ঠ কর্নেল বললেন : কৈফিয়ৎ? যেখানে-খুশি, যখন-ইচ্ছে, যেমন-করে চান-তা-ই পাবেন!

ট্রেন তখন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলো। আউদা, ফিক্স ও পাসপার্তুর কোনো কথা না-শুনেই ফগ গাড়ি থেকে নামলেন। কর্নেলও তাঁর অনুসরণ করলেন।

প্ল্যাটফর্মে নেমে ফগ নম্বরে বললেন দেখুন কর্নেল, তাড়াতাড়ি ইওরোপে ফিরেযাওয়া আমার বিশেষ দরকার। এখানে দেরি হলে আমার খুব লোকশান হবে।

কর্নেল বললেন : তাতে আমার কী?

ফগ আগের মতোই নরমগলায় বললেন : সান-ফ্রান্সিসকোতে আপনার সঙ্গে কলহ হবার পর আমি শপথ করেছিলুম আমার ইংল্যাণ্ডের কাজ শেষ হলেই আমি আপনার খোঁজে আবার আমেরিকায় ফিরে আসবো।

তীব্র ব্যঙ্গে ফেটে পড়লেন কর্নেল! বটে!

আজ থেকে ছ-মাস পরে আপনার সঙ্গে দেখা হবে কি?

ছ-মাস কেন, ছ-বছরই বলুন না!

আমি ছ-মাসের কথা বলছি। ছ-মাস পরে আমি ঠিক এখানে এসে হাজির হবো।

কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন : পাগল, না খ্যাপা? আমার কথাই হলো, নাউ অর নেভার।

বেশ, তা-ই হবে তাহলে। আপনি কি নিউইয়র্কে যাচ্ছেন?

আমি যেখানেই যাই না কেন, আপনার তাতে কী। এর পরের স্টেশনের নাম হলো প্লামফ্রিক। গাড়ি সেখানে দশমিনিট দাঁড়াবে। গোটাকতক বন্দুকের গুলি চালাতে সেখানে আর কতটুকু সময়ই বা লাগবে?

সে-ই ভালো। তবে আমি প্লামফ্রিকেই নামবো।

কর্নেল স্পর্ধা করে বললেন, সেখান থেকে আর উঠতে হবে না।

ধীরভাবে গাড়িতে উঠতে-উঠতে ফগ বললেন : কে জানে কী হবে?

গাড়ি ছেড়ে দিলো। আউদাকে আশ্বস্ত করে ফগ বললেন : যারা মুখে বেশি তড়পায়, তাদের কাছে আবার ভয় কী? মিস্টার ফিক্স, এই ডুয়েলে আপনি বোধহয় আমাকে সেকেণ্ড করবেন?

ফিক্স রাজি হলেন। ফগ আবার নির্বিকারভাবে হুইস্ট খেলা শুরু করলেন। একটু বাদেই যে তাকে প্রাণঘাতী ডুয়েল লড়তে হবে, সেজন্যে উদ্বেগের কোনো চিহ্নই ফগের মুখে দেখা গেলো না।

এগারোটার সময় ট্রেনের বাঁশি শুনে বোঝা গেলো প্লমফ্রিক স্টেশন এসে গেছে। ফগ উঠে দাঁড়ালেন। পাসপার্তু আর ফিকা রিভলভার নিয়ে তার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। ফ্যাকাশে মুখে আউদা মড়ার মতো আসনেই বসে রইলেন।

পরমুহুর্তেই পাশেই কামরার পা-দানিতে দেখা গেলো কর্নেল প্রক্টরকে। অন্য কেএকজন আমেরিকান তার দোসর হয়েছিলো। সবাই ট্রেন থেকে নামবার উদ্যোগ করতেই গার্ড বারণ করলো : নামবেন না আপনারা। গাড়ি কুড়ি মিনিট পেছিয়ে পড়েছে। আমি এখানে আর দাঁড়াবো না।

ফগকে দেখিয়ে কর্নেল বললেন : আমি এঁর সঙ্গে একটু ডুয়েল লড়বো বলে ঠিক করেছি।

গার্ড বললে : বড়ো দুঃখিত হলুম। কিন্তু কী আর করবো বলুন। ঐ শুনুন গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিলে। গার্ড সবিনয়ে বললে, আমায় মাপ করবেন আপনারা। অন্যদিন হলে আপনাদের জন্যে আমি একটু অপেক্ষা করতে পারতুম। তা আপনারা যদি একান্তই ডুয়েল লড়তে চান, চলতি ট্রেনেও তো তা হতে পারে।

ফগকে বিদ্রূপ করে কর্নেল বললেন : বোধহয় ওঁর তাতে সুবিধে হবে।

ফগ বললেন : আমার কোনো অসুবিধে হবে না—আপনার সুবিধে হলেই হলো।

গার্ড তখন তাদের সঙ্গে নিয়ে ট্রেনের একেবারে শেষ কামরাটায় গেলেন। কামরাটায় দশ-বারোজন মাত্র যাত্রী ছিলো। গার্ড তাদের বললে, এই দু-জন ভদ্রলোকের নিজেদের মধ্যে একটু হিশেব-নিকেশ আছে। আপনারা যদি এঁদের একটু জায়গা দিতে পারেন, তবে খুব ভালো হয়।

তাঁদের অনুগৃহীত করে যাত্রীরা পাশের কামরায় চলে গেলো।

কামরাটা পঞ্চান্ন ফিট লম্বা, সুতরাং বন্দুকের ডুয়েলের পক্ষে কোনোই অসুবিধে ছিলো না। ফিলিয়াস ফগ আর কর্নেল প্রক্টর কামরার মধ্যে ঢুকলেন রিভলভার হাতে। কামরার দরজা বন্ধ করে আর-সবাই অন্যখানে অপেক্ষা করতে লাগলো। ঠিক হলো, এঞ্জিনের সিটি শুনলেই লড়াই শুরু হবে এবং সে-লড়াই পুরো দু-মিনিট ধরে চলবে। এত-সহজে এত-তাড়াতাড়ি সব বন্দোবস্ত হয়ে গেলো যে ফিক্স আর পাসপার্তু কিরকম যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন।

ট্রেনের সিটির জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে সবাই যখন অপেক্ষা করছে, তখন হঠাৎ ভয়ানক গণ্ডগোল শুরু হলো। সেই হৈ-চৈ-এর মধ্যে ট্রেনের নানান জায়গা থেকে গর্জে উঠলো একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক। যাত্রীরা চেঁচিয়ে উঠলো। আর্তনাদে-আর্তনাদে তখন চারদিক মুখর হয়ে উঠেছে। কর্নেল প্রক্টর আর ফিলিয়াস ফগ রিভলভার হাতে যেখানে গোলযোগ সবচেয়ে বেশি, সেদিক পানে ছুটলেন।

একদল সিয়োক্স দস্যু চলতি ট্রেন আক্রমণ করেছিলো। আমেরিকার সেই নির্জন অঞ্চলে প্রায়ই তারা এ-ভাবে লুঠতরাজ চালাতো। তলোয়ার-বন্দুক নিয়ে ক্ষিপ্রবেগে ট্রেনের পা-দানির উপর উঠতে লাফিয়ে, লুঠ করতো যাত্রীদের যথাসর্বস্ব।

দস্যুদের মধ্যে একজন এঞ্জিনের উপর উঠে ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানকে আহত করলে। তার ইচ্ছে ছিলো ট্রেন থামানোর, কিন্তু এঞ্জিনের ব্যবহার না-জানায় সে খুলে ফেললো বাষ্প-নলের মুখ। অমনি ট্রেন না-থেমে বরং উল্কার মতো ছুটতে লাগলো। অন্যান্য দস্যুদের সঙ্গে যাত্রীদের ভীষণ লড়াই শুরু হয়ে গেলো। রিভলভার আর বন্দুকের শব্দে কেঁপে উঠতে লাগলো চারদিক।

ট্রেন ছুটছিলো উল্কার মতো। গার্ড রিভলভার চালাতে চালাতে ফগকে বললে : যদি ট্রেন থামাতে না-পারেন, তাহলে একজনও বাঁচবে না। ফোর্ট-কিয়ার্নি স্টেশন আর মাত্র পাঁচ-ছ মাইল দূরে। গাড়ি যদি স্টেশন পেরিয়ে চলে যায়, তাহলে দস্যুদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্যকোনো উপায় থাকবে না। উঃ! গার্ড আরো-কী বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় দস্যুদের একটা গুলি এসে তার বুক ভেদ করল। গার্ড ছিটকে পড়লো। ভলকে-ভলকে রক্ত উঠলো তার মুখ দিয়ে।

ফগ গার্ডের কথা শুনেই ট্রেন থামাবার জন্যে অগ্রসর হলেন। পাসপার্তু তার পাশেই ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে ছিলো। সে চেঁচিয়ে উঠলো, আপনি যাবেন না—যাবেন না! এ একটা সামান্য কাজ—আমারই উপর্যুক্ত।

ফগ তাকে বারণ করবার আগেই সে জানলা দিয়ে কামরার বাইরে চলে গেলো, আর খুব-সাবধানে ঝুলতে-ঝুলতে ট্রেনের সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। লাগেজ-গাডি ও এঞ্জিনের মাঝখানের লোহার রডটা একহাতে ধরে অন্যহাতে দু-গাড়ির সংযোজনশৃঙ্খল খুলে দিলে। যে-লোহার রডটা দিয়ে এঞ্জিনের সঙ্গে লাগেজ-গাড়ি আটকানো ছিলো, তা তখন মুহূর্তের মধ্যে গেলো ভেঙে। খালি এঞ্জিন বিদ্যুৎবেগে ছুটে চললো সামনে দিকে, আর প্রতি মুহূর্তেই কমতে লাগলো বাদবাকি ট্রেনের গতি। দেখতেদেখতে ট্রেনটা ফোর্ট-কিয়ার্নি স্টেশনের কাছে এসে একেবারে থেমে গেলো। দস্যুদল তখন পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো।

আরোহীদের মধ্যে যারা জখম হয়েছিলো, তাদের কারু আঘাতই তেমন সাংঘাতিক ছিলো না। মৃতের সংখ্যাও খুব বেশি ছিলো না। কর্নেল প্রক্টর একটু-বেশি আহত হয়েছিলেন, অন্যান্য আহত যাত্রীদের সঙ্গে কর্নেলকে ফাস্ট-এডের জন্যে রেলস্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো।

আউদা আর ফগ কিন্তু একেবারেই আহত হননি। ফিল্মের কাঁধের খানিকটা মাংস দুড়ে গিয়েছিলো মাত্র। কিন্তু পাসপার্তুকে পাওয়াই গেলো না—কেউই তার কোনো সন্ধান। দিতে পারলে না। আউদা তার জন্যে কাঁদতে শুরু করলেন, আর ফগ অপলক চোখে

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। আউদা সকাতর চোখে ফগের দিকে তাকালেন। সে-দৃষ্টির মানে বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না ফগের। কর্তব্য ঠিক করে নিয়ে আউদার দিকে তাকিয়ে বললেন : জ্যান্ত কিংবা মরা—আমি পাসপার্তুকে খুঁজে বার করবোই। আউদা সে-কথা শুনে আবেগভরে ফগের হাত চেপে ধরলেন।

ফিলিয়াস ফগ শপথ করলেন যে, যে করেই হোক পাসপার্তর সন্ধান না-করে আমেরিকা ছেড়ে যাবেন না—সেজন্যে যদি যথাসর্বস্ব যায়, তাতেও রাজি। তাঁর এ-কথা ভালো করেই জানা ছিলো যে, পথে একদিন দেরি হলেই নিউইয়র্ক গিয়ে ইংল্যাণ্ড যাবার জাহাজ আর পাবেন না—আর নিই-ইয়র্কে জাহাজ ধরতে না পারলে বাজিতে নিশ্চিতভাবেই তাকে হারতে হবে। কিন্তু পাসপার্তুর অনুসন্ধান করাই কর্তব্যনিষ্ঠ ফগের কাছে বড়ো হয়ে দাঁড়ালো।

ফোটকিয়ানি একটা ছোটো দুর্গ। দুর্গের সৈন্যরা বন্দুকের আওয়াজ ও তুমুল হৈচৈ শুনে আগেই রেলস্টেশনে এসে হাজির হয়েছিলো। ফগ তাদের কম্যাণ্ডারকে বললেন : দেখুন, তিনজন যাত্রীর কোনো খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না।

তারা মরে গেছে নাকি?

মরুক আর দস্যুর হাতে বন্দীই হোক, তাদের খোঁজ করতেই হবে। আপনি কি সৈন্য নিয়ে দস্যুদের অনুসরণ করতে চান?

কম্যাণ্ডার বললেন, এ তো বিষম সাংঘাতিক কথা! তারা যে পালাতে-পালাতে কোথায় যাবে তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে? আমি তো আর দুর্গ অরক্ষিত অবস্থায় রেখে

যেতে পারিনে! কে জানে সুবিধে পেলে দস্যুরা এসে দুর্গ আক্রমণ করবে কি না। তিনজনের জন্যে তো আর পঞ্চাশজনের জীবন বিপন্ন করতে পারিনে। দস্যুর আক্রমণে অনেকেরই তো প্রাণ গিয়েছে। কিন্তু তার আর কী করবেন বলুন। এ-রকম অপঘাত মরণ তো এখানে আখছারই হচ্ছে।

পঞ্চাশজনের জীবন বিপন্ন হবে কি না জানিনে-কিন্তু আমার মনে হয় তিনজনকে বাঁচাবার চেষ্টা আপনার করাই উচিত।

কমাণ্ডার তীব্রক বললেন : আমাকে আমার কর্তব্য বুঝিয়ে দিতে পারে এমন লোক তো এখানে দেখছিনে!

শান্তগলায় ফগ বললেন : বেশ। আমি তাহলে একাই যাবো।

ফিক্সের কাছে ফগের একা যাওয়ার কথা ভালো লাগলো না। এতদুর অনুসরণ করে এসে কি শেষটায় ব্যাংক-দস্যুকে নাগাল থেকে হারাবেন? তিনি বললেন : আপনি একাই দস্যুদের অনুসরণ করতে চান? না, না—সে হবে না।

আপনি কি বলতে চান যার জন্যে আমরা প্রাণ পেয়েছি, সেই অকুতোভয় পাসপার্তুকে দস্যর কবলে ফেলে আমি চলে যাবো? ককখনো তা হবে না। আমি নিশ্চয়ই তার খোঁজ করতে যাবো!

ফগের কথা শুনে কম্যাণ্ডার কী ভাবলেন, কে জানে! বললেন : আপনাকে আর একা যেতে হবে না—আপনি দেখছি সত্যিকার বীর। তারপর সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন : আমি ত্রিশজন লোক চাই-কে-কে যাবে, এসো।

ডাক শুনে সবাই যখন এগিয়ে এলো, তখন কমাণ্ডার ত্রিশজনকে বাছাই করে নিয়ে যাত্রার জন্যে কম দিলেন এক ধীর-স্থির প্রবীণ অফিসার সেই দলের নেতৃত্ব নিলেন।

ফগ কাণ্ডারকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা হচ্ছেন দেখে ফিক্স এগিয়ে এলেন। বললেন : আমাকে কি সঙ্গে নেয়া যায় না?

আপনার যা-ইচ্ছে তা-ই করতে পারেন। তবে আপনি যদি মিসেস আউদার ভার নিতেন, তাহলেই আমার বেশি উপকার হতো। আমারও তো বিপদ ঘটতে পারে।

ফিক্সের মুখ শুকিয়ে গেলো। এত পরিশ্রম করে বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে এতদিন ধরে যার অনুসরণ করে এলেন, আজ কি না তাকে একা ছেড়ে দিতে হচ্ছে, চোখের আড়াল করতে হচ্ছে তীব্র চোখে ফগের দিকে তাকালেন তিনি। দেখতে পেলেন, ফগের মুখে কুটিলতার কোনো চিহ্নই নেই। ফগের সরল দৃষ্টির কাছে হার মানলেন ফিক্স। গ্রহণ করলেন আউদার দেখাশোনার ভার।

ফিলিয়াস ফগ তার ব্যাংক-নোটে বোঝাই ব্যাগটা আউদার হাতে দিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে এগুলেন। যাত্রার সময় সৈন্যদের বললেন : যদি আমরা বন্দীদের উদ্ধার করতে পারি, তাহলে আপনাদের একহাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবো বলে শপথ করছি।

একটু বাদেই ফগ ফৌজ নিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। আউদা তখন ওয়েটিংরুমে বসে-বসে ভাবছিলেন মহৎহৃদয় ফগের কথা। আর ফিক্স বাইরে একটা চেয়ারে বসে ভাবছিলেন, আমি কী গর্দভ! পকেটে ওয়ারেন্ট থাকতেও আমি কিনা দস্যুটাকে ছেড়ে দিলুম! আর কি সে ফিরে আসবে? বোধহয় না। সে আমাকে নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়েছে। অমনি তার মনে হলো, বরফের উপর পায়ের ছাপ দেখে-দেখে ফগকে এখনও অনুসরণ করা চলে! কিন্তু সে আশায় যে ছাই, তা বুঝতে তার দেরি হলো না। যেতেযেতেই আরো-বরফ পড়বে, আর তাহলেই কোনো পদচিহ্ন থাকবে না। ফিক্স হতাশ হয়ে পড়লেন। তার চোখের সামনে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

সময় কারু জন্যে বসে থাকে না। বরফের কুচি আর কুয়াশার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চললো সময়। দেখতে-দেখতে বাজলো তিনটে। এমন সময় হঠাৎ ট্রেনের সিটি শোনা গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেলো, একটি ট্রেনের এঞ্জিন স্টেশনের কাছে এসে থেমেছে।

পাসপার্তু যে-এঞ্জিনটা ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলো তা অনেক দূর অব্দি বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়েছিলো। কিন্তু ক্রমে কয়লা ফুরিয়ে যেতেই অনেক দূর গিয়ে ধীরেধীরে থেমে পড়েছিলো। আহত ড্রাইভারের ইতিমধ্যেই জ্ঞান ফিরে এসেছিলো। সে তক্ষুনি সকল অবস্থা বুঝতে পারলে। আবার আগুন জ্বেলে বিচ্ছিন্ন ট্রেনের খোঁজে সে ফের ফিরে আসতে লাগলো। কুয়াশায় কয়েক হাত দূরের জিনিশই দেখা যাচ্ছিলো না। ফোর্টকিয়ার্নি স্টেশন যাতে পেরিয়ে চলে না-যায়, সেজনে ড্রাইভার বার-বার সিটি দিচ্ছিলো।

এঞ্জিন আসতেই যাত্রীরা আনন্দিত হয়ে উঠলো। বিচ্ছিন্ন ট্রেন আবার এঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত করা হলে আউদা নতুন গার্ডকে শুধোলন, গাড়ি কখন ছাড়বে?

এক্ষুনি।

কিন্তু বন্দীরা? আর যারা তাদের খোঁজে গেছেন–

তা বলে তো আমি আর বসে থাকতে পারিনে। এমনিতেই গাড়ি তিন ঘণ্টা পেছিয়ে পড়েছে।

সান-ফ্রান্সিসকো থেকে আবার কখন গাড়ি আসবে?

কাল সন্ধের সময়।

তাহলে তো খুব দেরি হয়ে যাবে। আপনি কি একটুও অপেক্ষা করতে পারবেন।?

অসম্ভব। যদি যেতে হয় তবে আসুন, অযথা আর দেরি করবেন না।

তাদের ফেলে রেখে আমি কিছুতেই যাবো না।

আহত যাত্রীরা সকলেই গাড়িতে উঠে বসলো। ট্রেন ছেড়ে দিলে।

ফিক্স খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। ট্রেন পেলেই চলে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সত্যি-সত্যিই যখন ট্রেন পাওয়া গেলো, তখন তিনি আর গেলেন না। ভাবলেন, দেখা যাক, শেষ অব্দি কী হয়। আবার তো ট্রেন পাওয়া যাবে।

বরফ যেমন পড়ছিলো তেমনি পড়তে লাগলো। আরো-ঘন হয়ে জল থেকে কুয়াশা উঠলো। আগের মতোই বইতে লাগলো ঠাণ্ডা হাওয়া। ক্রমে সন্ধ্যা হলো। রাত্রির অন্ধকারে স্টেশনটা ভুতের মতো নিঃঝুম হয়ে পড়ে রইলো। আশঙ্কায়, উৎকণ্ঠায় রাত্রে ঘুম হলো না আউদার। কিন্তু ফগদের কোনো খোঁজই পাওয়া গেলো না। ভোরবেলা আবহাওয়া অনেকটা ভালো হলো বটে, কিন্তু তখনও ফগের কোনো খবর পাওয়া গেলো না। আউদা আর ফি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। সৈন্যদের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়লেন কম্যাণ্ডার।

ক্রমে বেলা বেড়ে চললো। চিন্তিত কমাণ্ডার তাদের খোঁজে দুর্গের বাকি সৈন্যদের পাঠাবেন বলে ঠিক করলেন। সৈন্যরা তৈরি হলো। এমন সময় হঠাৎ দূরে বন্দুকের আওয়াজ হলো। খানিকক্ষণের মধ্যে ফিলিয়াস ফগ, জাঁ পাসপার্তু ও আর-সবাই স্টেশনে এসে হাজির হলো।

ফোর্ট-কিয়ার্নি থেকে মাইল-দশেক দুরে দস্যুদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছিলো। তারা দূর থেকেই পাসপার্তু আর অন্য দুজন যাত্রীকে দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করতে দেখতে পেয়েছিলেন। এমন সময় ফগ ফৌজ নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে সবাইকে উদ্ধার করলেন।

পাসপার্তু স্টেশনে এসেই ফিকে দেখে শুধোলে : ট্রেন কই? তার ভরসা ছিলো, তাদের এই বিপদের মধ্যে রেখে ট্রেন কখনোই চলে যাবে না।

ফিক্স ভারিগলায় বললেন : ট্রেন নেই, চলে গেছে।

ফগ শাতকণ্ঠে শুধোলেন : আবার কখন গাড়ি পাওয়া যাবে?

সন্ধ্যার আগে না।

এ-কথা শুনে ফিলিয়াস ফগ অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন : তাই তো।

১১. কখনও হতাশ হতে নেই

ফিলিয়াস ফগের কুড়ি ঘণ্টা দেরি হয়ে গেলো। পাসপার্তু খুব দুঃখিত হয়ে পড়লো। ভাবতে লাগলো, আমার জন্যেই সর্বনাশ ঘটলো ফিলিয়াস ফগের।

ফিক্স ফগকে বললেন : সত্যিই কি আপনার তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার? বিলেতের ডাক-জাহাজ ধরতে চান বুঝি? তাহলে এগারো তারিখের আগেই আপনার নিউইয়র্ক পৌঁছুনো দরকার।

হ্যাঁ। ডাক-জাহাজের ওপরই আমার সর্বস্ব নির্ভর করছে।

যদি এ-সব বাধা-বিপত্তি না-ঘটতো তাহলে তো এগারো তারিখ ভোরেই নিউইয়র্ক যেতে পারতেন।

হ্যাঁ, তাহলে আমার হাতেই বরং আরো বারোঘণ্টা সময় বেশি থাকতো।

আপনার তো সাকুল্যে কুড়ি ঘন্টা মাত্র দেরি হয়েছে-তার থেকে বারো ঘণ্টা বাদ দিলে থাকে আট ঘণ্টা। এই আট ঘণ্টার বিলম্বে যাতে আপনার কোনো ক্ষতি না-হয়, তা কি আপনি করতে রাজি আছেন?

নিশ্চয়ই। কিন্তু কী করে সে আট ঘণ্টা পুষিয়ে নেবো?

যখন বরফ পড়েছে, তখন স্লেজ গাড়ি বেশ চলবে। হাওয়াও আছে, পাল তুলে দিলে রেলের মতোই দ্রুতগতিতে যাবে। একটা লোক তার স্লেজ ভাড়া দিতে পারে

বলছিলো।

স্টেশনের কাছেই স্লেজ-ওলার বাড়ি। ফগ স্লেজ দেখে তো খুব খুশি হয়ে পড়লেন। গাড়িটা বেশ ভালোই, অনায়াসেই পাঁচ-ছজন লোক ধরবে তাতে। গাড়ির ঠিক মাঝখান থেকে একটা মাস্তুল উঠেছে উপরে, আর তাতে ঝুলছে বড়ো-একটা পাল। হালও ছিলো গাড়ির।

স্লেজ-ওলা বললে : পশ্চিম থেকে হাওয়া বেশ জোরে বইছে, বরফও জমে খুব শক্ত হয়ে গিয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ওমাহা স্টেশনে যেতে পারবো। ওমাহায় নিউইয়র্ক আর শিকাগোর বহু ট্রেন পাওয়া যায়।

তখন বেলা আটটা। ফগ তখুনি যাত্রার ব্যবস্থা করলেন। সবাই স্লেজে উঠে বসলেন। স্লেজ-ওলা পাল তুলে দিলে। প্রবল হাওয়ায় পাল ফুলে উঠলো। দুলতে লাগলো স্লেজ। তক্ষুনি সেই মসৃণ অথচ কঠিন বরফের উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটলো স্লেজ। হিশেব করে দেখা গেলো, স্লেজ যাচ্ছে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে। ফোর্ট-কিয়ার্নি থেকে ওমাহা স্টেশন দুশো মাইল। এভাবে স্লেজ চলতে থাকলে বেলা একটার মধ্যেই ওমাহা পৌঁছুনো যাবে বলে আন্দাজ হলো।

শীতে গায়ের রক্ত পাস্ত জমে যাবার জোগাড় হয়েছিলো। সবাই নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। দিগন্তবিহীন বরফের উপর দিয়ে ছুটে চললো স্লেজ। সুদক্ষ স্লেজ-ওলা দৃঢ়হাতে হাল ধরে সোজা নাক-বরাবর স্লেজ চালিয়ে দিলে। স্লেজ যেন উড়ে চলতে লাগলো।

বেলা বারোটার সময় স্লেজ-ওলা পাল নামিয়ে দিয়ে বললে : ঐ-যে ওমাহা দেখা যায়।

ফগ তাকিয়ে দেখলেন, দূরে কতগুলো বরফ-ছাওয়া ঘরদোর দেখা যাচ্ছে। স্লেজ সেখানে গিয়ে থামতেই তারা দ্রুতপদে স্লেজ থেকে নেমে শিকাগোর একটা ট্রেনে উঠে বসলেন। আর পাঁচমিনিট দেরি হলেই ট্রেনটা ধরা যেতো না।

পরদিন দশই ডিসেম্বর বিকেল চারটের সময় শিকাগোতে পৌঁছেই তারা শুনলেন, এক্ষুনি নিউইয়র্ক যাবার জন্যে একটা ট্রেন ছাড়ছে। ফগ তার দলবল নিয়ে ট্রেনে উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিলে। পরদিন বেলা এগারোটার সময় ট্রেন এসে নিউইয়র্কের জাহাজ-ঘাটে থামলো। ট্রেন থেকে নেমে তারা শুনলেন, লিভারপুলে যাবার জাহাজ চায়না পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে বন্দর ছেড়েছে! পাসপার্তু কাতরকণ্ঠে বলে উঠলো : হায়, হায়! চায়নার সঙ্গে-সঙ্গে ফগের সকল আশাই অথৈ জলে ভেসে গেলো। লিভারপুলে যাওয়ার তখন আর-কোনো জাহাজ ছিলো না।

পাসপার্তু পাগলের মতো হন্যে হয়ে উঠলো। আউদা তো একেবারে ভেঙে পড়লেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্যেই শেষে সব গেলো! এত পরিশ্রম, এত টাকাখরচসব গেলো বৃথা! পাসপার্তু নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। সে জানতো যে, তার জন্যেই এ-বিভ্রাট ঘটলো। ফগ কিন্তু তাকে একফোঁটাও তিরস্কার করলেন না। সর্বনাশ হয়ে গেলো দেখেও

বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। সোজা নিকোলাস হোটেলে এসে আশ্রয় নিলেন। আউদাকে সানা দেবার জন্যে একবার শুধু বললেন : ককখনো হতাশ হতে নেই।

সে-রাত্রে উৎকণ্ঠায় অন্য-কারু ঘুম না-এলেও ফগের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি।

পরদিন বারোই ডিসেম্বর। ফগের হাতে তখন মোট সময় ছিলো ন-দিন তেরোঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। যদি চায়না জাহাজ ধরা যেতো, তাহলে ঠিক সময়ের মধ্যেই লণ্ডন পৌঁছে বাজি জিততে পারতেন ফগ। পাসপার্তু এইসব কথা ভেবে-ভেবে নিজের মাথার চুল ছিড়তে লাগলো।

ফগ সঙ্গীদের বললেন : যতক্ষণ-না ফিরে আসি, আপনারা এখানেই থাকবেন। ডাকবামাত্রই যাতে রওনা হতে পারেন তার বন্দোবস্ত করে রাখবেন। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। যাবার কোনো উপায় হয় কি না আমি একবার দেখে আসি।

ফগ হাডসন নদীর তীরে এসে হাজির হলেন। দেখলেন, অনেক জাহাজই বন্দর ছাড়বার উদ্যোগ করছে, কিন্তু সেগুলো সবই পালের জাহাজ, কলের নয়। সুতরাং এত জাহাজ থাকলেও কোনো সুবিধে হলো না! ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে এস, এস, আঁরিয়েতা নামে একটা ছোটো জাহাজ তার নজরে পড়লো। ফগ একটা নৌকো করে জাহাজে গিয়ে উঠলেন। ক্যাপ্টেন জাহাজেই ছিলেন। তার সঙ্গে দেখা করে ফগ বললেন : আমার নাম ফিলিয়াস ফগ, বাড়ি লণ্ডনে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আমিই ক্যাপ্টেন। নাম আন্দু সিপার্ভি, বাড়ি কার্দিফে।

আপনি বুঝি এখুনি জাহাজ ছাড়ছেন?

একঘণ্টার মধ্যেই ছাড়বো। বোর্দো যাচ্ছি।

কী বোঝাই নিয়েছেন?

কিছু-না। জাহাজ খালি। না, কোনো যাত্রী নেই জাহাজে। আমি যাত্রী নিইনে, বড় বিরক্ত করে তারা।

আপনার জাহাজ কি তাড়াতাড়ি চলতে পারে?

ঘণ্টায় তেরো-চোদ্দ মাইল যায়। আঁরিয়েতা জাহাজের নাম এ-এলাকায় সব্বাই একডাকে জানে।

আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাকে আর আমার তিন বন্ধুকে লিভারপুল নিয়ে যেতে পারেন?

বিদ্রূপের সুরে ক্যাপ্টেন বললেন : লিভারপুল! বলুন না কেন একদম চিনদেশেই নিয়ে যাই! ও-সব আমার দ্বারা হবে-টবে না। আমি বোর্দো যাবো ঠিক করেছি, সেখানেই যাবো।

যদি অনেক টাকা দিই?

টাকায় কী হবে? এ-জাহাজ আমার। আমাকে টাকার লোভ দেখাবেন না।

আমি যদি জাহাজ ভাড়া চাই?

ভাড়া? আমি ভাড়া দিইনে।

ভাড়া না-দিলে বিক্রি করুন।

তাও না।

অবিচলিত-চিত্ত ক্যাপ্টেনের কথা শুনেও ফগ হতাশ হলেন না। যে করেই হোক, অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে লিভারপুল যেতেই হবে। মনে-মনে একটা মৎলব স্থির করে ক্যাপ্টেনকে আবার বললেন : ক্যাপ্টেন সিপার্ডি, আপনি কি আমাকে বোর্দো নিয়ে যাবেন?

হাজার টাকা দিলেও যাত্রী নেবো না আমি।

আমি যদি একেকজনের জন্যে পাঁচশো পাউণ্ড করে দিই?

প্রত্যেক যাত্রীর জন্যে?

হ্যাঁ, প্রত্যেকের জন্যে।

আপনারা তো চারজন আছেন, না? ক্যাপ্টেন সিপার্ডি মাথা চুলকোতে লাগলেন। একসঙ্গে দু-হাজার পাউণ্ড লাভ, অথচ তার জন্যে একপয়সাও খরচ নেই। শেষটায় লোভই জয়ী

হলো। ক্যাপ্টেন বললেন : আমি কিন্তু কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক ন-টায় জাহাজ ছাড়বো। সময়মতো হাজির হতে পারলে জাহাজে জায়গা হবে।

ন-টার আগেই সবাই জাহাজে এসে উঠলেন। ন-টার সময় জাহাজ বোর্দো যাত্রা করলো। আর ফিক্স অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, এ-কী! যাবো ইংল্যাণ্ডে আর কোথায় চলেছি। কোথায় বোর্দো আর কোথায় লিভারপুল! এর মানে তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

আঁরিয়েতা জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের যে বিশেষ সদ্ভাব ছিলো না, জাহাজে উঠেই ফগ তা বুঝতে পারলেন। প্রচুর টাকা দিয়ে একদিনের মধ্যেই নাবিকদের হাতে আনতে তাই ফগকে কোনো বেগ পেতে হলো না। যে-করেই হোক, আরিয়ে যাতে লিভারপুল যায়, সে-ব্যবস্থা করতেই হবে। নাবিকদের সাহায্যে ফগ ক্যাপ্টেন সিপার্ডিকে তার ক্যাবিনে বন্দী করে রাখলেন, আর নিজেই ক্যাপ্টেন হয়ে লিভারপুলের দিকে জাহাজ চালাতে লাগলেন।

এ-যে মিউটিনি! সমুদ্রে কোনো জাহাজে ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে অন্য মাঝিমল্লারা বিদ্রোহ করলে সে-যে ভয়ংকর কাণ্ড হয়। ধরা পড়লে প্রত্যেকের কঠোর সাজা হয়–প্রায়ই প্রাণদণ্ড জোটে বিদ্রোহীদের।

ব্যাপার দেখে ফিক্সের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। মনে-মনে আপোশ করতে লাগলেন, কেন মরতে এলুম এই দস্যুর সঙ্গে। ফিলিয়াস ফগ ককখনো লিভারপুল যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই ও একজন বোম্বেটে, জলদস্যু, চলেছে নিজের গুপ্ত আড্ডায়। সেখানে না-জানি কী দুঃসহ দুরবস্থাই আমার বরাতে আছে!

ফগ যেভাবে জাহাজ চালাতে লাগলেন, তাতে মনে হলো এ-কাজে তিনি খুবই দক্ষ। পাসপার্তু তো রীতিমতো অবাক হয়ে গেলো। নাবিকেরা নতুন ক্যাপ্টেনের সদ্ব্যবহারে আর বদান্যতায় এত খুশি হয়েছিলো যে প্রাণপণে কাজ করতে লাগলো। আঁরিয়েতা পূর্ণগতিতে লিভারপুল অভিমুখে এগিয়ে চললো।

আজ যোলোই ডিসেম্বর। পঁচাত্তর দিন কেটে গেছে। এখনও অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের পথে অনেকদূর যেতে হবে। দুর্ভাগ্য ছিলো ফগের সঙ্গে-সঙ্গেই। আঁরিয়েতার এঞ্জিন ম্যান দুঃসংবাদ জানালে : জাহাজের কয়লা ফুরিয়ে এসেছে। যেদিন থেকে জাহাজ ছেড়েছি, সেদিন থেকেই সমানে আগুন রেখেছি। লিভারপুলে যাওয়ার মতো কয়লা জাহাজে ছিলো না। বোর্দো যাওয়ার মতোই কয়লা নিয়েছিলুম আমরা।

ফগ নিশ্চিন্তভাবে হুকুম দিলেন : আচ্ছা, যাও। যতক্ষণ কয়লা আছে, পুরোদমে চলিয়ে যাও তো। আমি এইফাকে ভেবে দেখি, কী করা যায়।

আঠারো তারিখে যখন এঞ্জিনম্যান এসে চরম খবর দিয়ে গেলো—আর একটুও কয়লা নেই, অবিচলিত ফগ তখন পাসপার্তুকে বললেন : ক্যাপ্টেন সিপার্ডিকে এখানে নিয়ে এসো।

ক্যাপ্টেন সিপার্ডিকে দেখে মনে হলো যেন একটা ভীষণ বোমা ফেটে পড়বার জন্য অপেক্ষা করছে। কাছে এসেই ক্যাপ্টেন গম্ভীরস্বরে ফগকে শুধোলেন : আমরা এখন কোথায় আছি?

লিভারপুল থেকে সাতশো সর মাইল দূরে।

জবাব শুনেই ক্যাপ্টেনের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে উঠলো। গর্জন করে বললেন, তবে রে বোম্বেটে!

সে-কথায় কান না-দিয়ে শান্তগলায় ফগ বললেন : আপনার জাহাজ আমার কাছে বিক্রি করুন।

ককখনো না!

যদি বিক্রি না-করেন, তবে বাধ্য হয়েই জাহাজটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে আমায়।

কী! আপনার দুঃসাহস তো কম নয়! আমার জাহাজ পোড়াবেন!

নিশ্চয়ই। অন্তত উপরকার যা-কিছু কাঠের জিনিশ আছে, সবই পোড়াতে হবে। জাহাজের কয়লা ফুরিয়েছে। কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে!

চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন সিপার্ডি : আপনার যাওয়া চাই বলে আমার জাহাজ পোড়াবেন? জাহাজের দাম কত জানেন? নগদ পাঁচ হাজার পাউণ্ড!

এই নিন, আমি ছ-হাজার দিচ্ছি। ফগ তক্ষুনি একতাড়া ব্যাংক-নোট ক্রুদ্ধ ক্যাপ্টেনের পকেটের মধ্যে ফেলে দিলেন।

নগদ ছ-হাজার পাউণ্ড! মুহূর্তে সব রাগ জল হয়ে গেলো ক্যাপ্টেনের। পুরোনো একটা জাহাজের বদলে এতগুলো টাকা পেয়ে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন আন্দ্রু সিপার্ডি। বললেন : জাহাজের খোল আর এঞ্জিন তো আমার?

বেশ। খোল আর এঞ্জিন আপনার। রাজি তো?

নিশ্চয়ই। টাকা গুনতে-গুনতে ক্যাপ্টেন বললেন : জাহাজের যত কাঠ আছে সবই আপনার।

খামকা-খামকা এতগুলো টাকা উড়ে গেলো দেখে পাসপার্তু আর ফিক্স তো হতভম্ব! তাও জাহাজের খোল আর এঞ্জিন কিনা ক্যাপ্টেনেরই রইলো।

কিন্তু তখন ভাববার কোনো সময় নেই, হতভম্ব হবারও নয়। পাসপার্তু একাই বিপুল উৎসাহে কাঠ কাটতে লাগলো। কয়লার বদলে জাহাজের শুকনো কাঠগুলো ব্যবহৃত হতে লাগলো। সেইদিনই জাহাজের ক্যাবিনগুলো, ডেকের একাংশ প্রভৃতি ছাই হয়ে গেলো।

পরদিন উনিশে ডিসেম্বর জাহাজের মাস্তুল আর বড়ো কাঠগুলো পোড়ানো হলো। প্রাণপণে জাহাজ চালাতে লাগলো নাবিকেরা।

পরদিন আঁরিয়েতার সব কাঠই গেলো ফুরিয়ে, শুধু খোলটা রইলো বাকি। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লিভারপুলে যাওয়া চাই। নাবিকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলো।

দূরে কুইন্স-টাউনের আলো দেখে ক্যাপ্টেন সিপার্ডি বললেন : আর-কোনো আশা নেই, মিস্টার ফগ। এই সবেমাত্র আমরা কুইন্সটাউন ছাড়ছি। এখনও অনেকদূর যেতে হবে। আপনার বরাৎ খারাপ-আমি কী করবো বলুন?

ফগ বললেন : ঐ-যে আলো দেখা যাচ্ছে, সে কি কুইন্স-টাউনের? আমরা কতক্ষণে বন্দরে পৌঁছুতে পারবো?

তিনটের আগে না। জোয়ার চাই তো।

অবিচলিত স্বরে ফগ বললেন : তবে এখন জোয়ারের জন্যেই অপেক্ষা করা যাক। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। হতাশা মানেই তো মৃত্যু।

১২. ভাগ্য যখন বিরূপ

আমেরিকার ডাক কুইন্স-টাউনে নামতো। একটি দ্রুতগামী ট্রেনে সেই ডাক পাঠানো হতো ডাবলিনে। ডাবলিনে ডাক নেবার জন্যে লিভারপুলগামী স্টীমার প্রস্তুতই থাকতো। ফগ হিশেব করে দেখলেন, সেই পথে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের বারো ঘণ্টা আগেই লিভারপুল পৌঁছুনো যাবে—আর অনায়াসেই আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছুনো যাবে লণ্ডন।

রাত একটার সময় আঁরিয়েতা কুইন্সটাউনে নোঙর করলো। তিলমাত্র দেরি নাকরে ফগ ট্রেনে উঠলেন, আর পরদিন বেলা এগারোটা চল্লিশ মিনিটের সময় পৌঁছুলেন লিভারপুল।

লণ্ডন সেখান থেকে ছ-ঘণ্টার পথ। ট্রেনেরও অভাব ছিলো না। ফগ বুঝলেন, বিজয় সুনিশ্চিত। পাসপার্তু তো আনন্দে নেচেই উঠলো। ঠিক সেই সময় ফিক্স ফগের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন : মিস্টার ফিলিয়াস ফগ, চুরির অপরাধে রাজার নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম।

কিলিয়াস ফগ বন্দী হলেন। এতক্ষণে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। ফিক্স তাকে কাস্টমস-হাউসেরই একটা ঘরে বন্দী করে রাখলেন।

পুলিশ বাধা না দিলে পাসপার্তু নিশ্চয়ই ফিকে তখন ছিঁড়ে ফেলতে। মন তার ক্ষোভে-দুঃখে ভেঙে পড়লো। ঈশ! আগেই যদি সে ফগকে ফিক্সের পরিচয় দিতে, তাহলে তো

এমনটা ঘটতো না! আর আউদাকে দেখে মনে হলো, তিনি যেন এইমাত্র আবার একবার জ্বলন্ত চিতা থেকে উঠে এসেছেন।

ঠিক যখন বাজি জিতে গৌরবের স্বর্ণমুকুট পরবেন মাথায়, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটলো সর্বনাশ! পথের ভিখিরি হয়ে পড়লেন ফগ। তখনও পৌনে ন-ঘণ্টা সময় ছিলো। লণ্ডন পৌঁছুতে ছ-ঘণ্টার বেশি লাগতো না। ভাগ্য বিরূপ বলেই বিনা-মেঘে এমনভাবে বজ্রাঘাত হলো।

ফগ নির্বাক হয়ে বন্ধ ঘরে বসে রইলেন। তার মনে তখন যে-ঝড় চলছিলো, তার কোনো চিহ্নই তার ভাবলেশহীন মুখে দেখা গেলো না। সকলেই দেখলো, ফগ তার ঘড়িটা সামনের টেবিলের উপর রেখে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন একমনে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা প্রভৃতি গুনছেন। উজ্জ্বল চোখের তারায় একটা অস্বাভাবিক আলো ছাড়া এই ভীষণ দুর্ঘটনাতেও তার কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো না।

অস্থির পদক্ষেপে সারা ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন ফগ। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে আবার বসলেন চেয়ারে। পকেট থেকে ডায়রিটা বের করে পড়লেন : একুশে ডিসেম্বর, শনিবার-লিভারপুল। তার নিচে ফগ লিখলেন : আশিদিনের দিন, বেলা এগারোটা চল্লিশ মিনিট।

নির্বাক হয়ে ফিলিয়াস ফগ বসে রইলেন। কাস্টমস হাউসের ঘড়িতে ঢং করে বেলা একটা বাজলো। ফগ দেখলেন তাঁর নিজের ঘড়ি দু-মিনিট ফাস্ট।

ক্রমে বাজলো দুটো। তখনও মুক্তি পেলে একটি অত্যন্ত দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেন ধরতে পারতেন ফগ-তাহলে তার জয় হতো।

পনেরো মিনিট গেলো, কুড়ি মিনিট গেলো, কাটলো আধঘণ্টা। আর-কোনো আশা নেই!

হঠাৎ সশব্দে বন্ধ ঘরের দরজা খুলে গেলো। ফিক্স আর পাসপার্তুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন আউদা। ব্যগ্রকণ্ঠে ফি বললেন : মিস্টার ফগ, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। ভুল করে ধরা হয়েছিলো আপনাকে। আসল চোর ধরা পড়েছে। আপনার চেহারার সঙ্গে তার চেহারার অদ্ভুত মিল ছিলো বলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আপনি মুক্ত।

ফিলিয়াস ফগ মুক্ত হলেন। ধীরপায়ে ফিক্সের দিকে এগিয়ে গেলেন। একমুহূর্তের জন্যে তাকালেন তার মুখের দিকে। পরমুহূর্তেই তার একটা প্রচণ্ড ঘুসিতে ফি পড়ে গেলেন ঘরের মেঝেয়। একটাও কথা না-বলে ফগ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলেন।

ফগের দুর্ভাগ্য—রেল-স্টেশনে পৌঁছেই শুনলেন লণ্ডনের ট্রেন দুটো পাঁচ মিনিটের সময় চলে গেছে।

শিগগির কোনো ট্রেন নেই দেখে ফগ তখুনি একটা স্পেশ্যাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করলেন। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালো। ড্রাইভারকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে গাড়িতে উঠলেন ফগ। চেষ্টার ত্রুটি করলে না ড্রাইভার। কিন্তু ট্রেন যখন লণ্ডনে এসে পৌঁছুলো তখন স্টেশনের ঘড়িতে আটটা পঞ্চাশ বেজে গেছে।

সারা পৃথিবী ঘুরে ফিরতে ফিলিয়াস ফগের শেষপর্যন্ত মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেলো।

আর এই পাঁচ মিনিট দেরি হবার জন্যেই হার হলো ফিলিয়াস ফগের।

১৩. আউদার কথা

লণ্ডনে পৌঁছেই ফিলিয়াস ফগ সোজা বাড়ি চলে এলেন, ক্লাবে আর গেলেন না। এমনিতর সর্ব-বাজি-ধরা এক ভ্রমণে অপরের দোষে শেষমুহূর্তে হেরে-যাওয়া যে কী মর্মান্তিক তা অন্যে বুঝতে পারবে না। কিন্তু মিস্টার ফগ তখনও অবিচলিত। তার যথাসর্বস্ব তখন বারিং-এর গদিতে ছিলো—সে-টাকা এখন রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদের। খরচপত্র বাদে তার হাতে যা-কিছু সামান্য টাকাকড়ি ছিলো, তা নিয়েই কোনোরকমে এবার দিন কাটাতে হবে।

ফগ তাঁর বাড়ির একটা কোঠা আউদার জন্যে ছেড়ে দিলেন।

পাসপার্তু শুনেছিলো, অনেক সময় এ-রকম দুর্দশায় পড়লে হতাশ-হৃদয় মানুষ আত্মহত্যা করে সকল যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। ফগ যাতে তেমনকিছু করে না-বসেন সেজন্যে সে সতর্ক হয়ে রইলো। বলাবাহুল্য, বাড়ি পৌঁছেই পাসপার্তু তার কোঠার গ্যাসের বাতি নিভিয়ে দিয়েছিলো।

ক্রমে রাত এলো। রাত ঘনও হলো। সকলেই শুলেন। ফগ ঘুমিয়েছিলেন কি না কে জানে। তবে আউদা সারারাত দুশ্চিন্তায় কেঁদে-কেঁদে কাটিয়েছিলেন। আর পাসপার্তু সারারাত অতন্দ্র চোখে বসে ছিলো ফগের ঘরের দরজায়।

পরদিন ভোরবেলা পাসপার্তুকে ডাকলেন ফগ। বললেন : মিসেস আউদার প্রাতরাশের বন্দোবস্ত করো। আর বলে এসো আজ সন্ধ্যায় আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ফগ সেদিন আর রিফর্ম ক্লাবে গেলেন না। কী-ই বা দরকার যাওয়ার? সারাদিন ঘর বন্ধ করে বসে নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করছিলেন ফগ। পাসপার্ত মুহূর্তের জন্যেও সেই বন্ধ দরজা ত্যাগ করলে না। ঘরের মধ্যে সামান্য-একটু শব্দ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই উৎকর্ণ হচ্ছিলো সে–এই বুঝি ঘটলো কোনো দুর্ঘটনা। দরজার চাবির ফাঁক দিয়ে সে মধ্যে-মধ্যে ঘরের ভিতর দৃষ্টিক্ষেপ করে ফগকে দেখে নিচ্ছিলো।

ক্রমে সন্ধ্যা হলো। সাড়ে-সাতটার সময় ফগ আউদার ঘরে এসে চুল্লির পাশে একটা চেয়ারে বসলেন। তার ভাবলেশহীন মুখ দেখে কে বলবে যে তিনি এমনিতর একটি বাজিতে হেরেছেন। একটু চুপ করে থেকে আউদাকে বললেন : আপনাকে ইংল্যাণ্ডে এনে বড়ো অপরাধ করেছি। সেজন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।

চঞ্চল হয়ে উঠলো আউদার হৃদয়। তাকে যিনি মত্যর হাত থেকে ছিনিয়ে এনে বাঁচালেন, তিনি চাইছেন ক্ষমা? তার চোখ জলে ভরে এলো।

ফগ বলে চললেন : আমি যখন আপনাকে এখানে আসতে বলি, তখন আমার টাকার অভাব ছিলো না। ভেবেছিলুম সেই টাকার অর্ধেক আপনার জন্যে খরচ করবো। আপনি তাহলে স্বাধীনভাবে থাকতে পারতেন। আপনি তো জানেনই, এখন আমি পথের ভিখিরি।

ভাঙাগলায় আউদা বললেন : মিস্টার ফগ, আমি সবই জানি। আপনার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারি বোঝার মতো আসাটাই আমার অন্যায় হয়েছে। আমিই সেজন্যে ক্ষমা চাচ্ছি আপনার কাছে। আমিই তো ছিলুম আপনার ক্ষিপ্রগতির প্রধান বাধা। পথে আপনার কত

দেরিই না হলো আমার জন্যে। সে না-হলে কি আজ এমন দুর্দশা হয় আপনার! আমি যে আগুনে পুড়ে মরছিলুম সে-ই ছিলো ভালো।

আপনার জন্যে আমার একফোঁটাও দেরি হয়নি। সেজন্যে আপনি দুঃখিত হবেন। কিছুতেই আপনি ভারতবর্ষে নির্বিঘ্নে থাকতে পারতেন না। একদিন যারা আপনাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলো, তারাই আবার আপনাকে খুঁজে বার করতো।

আপনি মহৎ-হৃদয়, তাই সেই বিপদ থেকে আমাকে তো উদ্ধার করেইছিলেন, এখানে এসে যাতে আমি স্বাধীনভাবে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারি তার একটা ব্যবস্থাও করতে চেয়েছিলেন।

চেয়েছিলুম, কিন্তু হলো কই? আমার দুর্ভাগ্য সব ওলোটপালোট করে দিলে।

যা-ই হোক, আমার এখনও যা-কিছু আছে তাই আমি আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।

তাহলে আপনার কী করে চলবে? আপনি বোধহয় আপনার নিজের ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছেন না। আপনার যাতে কোনো অসুবিধে বা অভাব নাহয়, আপনার বন্ধুরা নিশ্চয়ই সেদিকে নজর রাখবেন।

আমার কোনো অভাব নেই বলেই সকল অবস্থাই আমার কাছে সমান, ভবিষ্যৎ ও। আমার কোনো বন্ধু-বান্ধবও নেই যে আমার জন্যে তাদের এত মাথাব্যথা হবে।

কিন্তু আত্মীয়-স্বজন?

এখন আর আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই।

মিস্টার ফগ, আপনার জন্যে আমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে। জীবনে আপনি এত একা–দুঃখের অশ্রু মুছিয়ে দিতে পারে এমন-কেউ নেই, সে-যে বড়ো ভয়ানক জীবন! লোকে কথায় বলে, দুঃখের বোঝা নেবার যদি অংশিদার থাকে, তবে সে-বোঝা যতই ভারি হোক না কেন, অনায়াসে ঘাড়ে নিতে পারা যায়। আউদা চেয়ার থেকে উঠে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন ফগের দিকে। আমি যদি আপনার দুঃখের বোঝর অংশিদার হতে, চাই তবে কি আপনার আপত্তি আছে? আপনি কি আমায় আপনার স্ত্রীর সম্মান দেবেন?

ফগও তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। চোখের তারা হয়ে উঠলো উজ্জ্বল। ফগ ডাকলেন পাসপার্তু!

পাসপার্তু ঘরে ঢুকে যখন দেখলো ফগ আউদার সামনে দাঁড়িয়ে তার নরম হাত দুটি ধরে আছেন, তখন সব-কিছু বুঝে ফেলতে তার একটুও দেরি হলো না। ফগ বললেন : গির্জের বিশপকে এক্ষুনি বিয়ের খবর দিতে হবে, পাসপার্তু। এখনও রাত বেশি হয়নি।

পাসপার্তু খুশিগলায় বললে : এ-খবরের আবার সময়-অসময় কী? কাল সোমবার। কালই কি বিয়ে হবে?

ফগ আউদার দিকে তাকালেন। সলজ্জ কণ্ঠে আদা বললেন : তা-ই হোক।

১৪. সব ভালো তার শেষ ভালো যার

এডিনবরায় যেদিন আসল চোর ধরা পড়লো, সেদিন ছিলো সতেরোই ডিসেম্বর। তখন আবার একটা হৈ-চৈ পড়ে গেলো। এতদিন ফগ একটা সাধারণ হীন দস্যু হিশেবে। পরিচিত হয়েছিলেন, একমুহূর্তেই সেই কলঙ্ক অপসৃত হলো। তখন আবার লোকের মুখে-মুখে ফিরতে লাগলো ফিলিয়াস ফগের নাম। আবার আশিদিনে পৃথিবী ঘোরা নিয়ে ধরা হতে লাগলো বাজি। জগে-মা সব খবরের কাগজগুলো ফের ফগের সম্পর্কে প্রত্যেক দিন নয়া-নয়া তত্ত্বকথা আউড়ে যেতে লাগলো।

শনিবার, একুশে ডিসেম্বর সন্ধ্যা হতেই রিফর্ম ক্লাবের আশপাশ লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেলো। সকলের মুখে এক কথা : আজ ফিলিয়াস ফগের আসবার দিন। রাস্তায়ঘাটে এত ভিড় হলো যে যানবাহন সমস্তই গেলো বন্ধ হয়ে। পুলিশ এসে চারদিকে কড়া পাহারা বসালে, যাতে কোনো গোলযোগ না-হয়।

রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরা বিকেলবেলাতেই ক্লাব-ঘরে এসে হাজির হয়েছিলেন। আটটা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় আন্দ্রে স্টুয়ার্ট বললেন : আর পঁচিশ মিনিট বাদেই নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবে। কই, মিস্টার ফগ তো এলেন না এখনও!

ফ্লানাগেন শুধোলেন : লিভারপুলের শেষ ট্রেন ক-টায় লণ্ডনে আসে?

র‍্যাল্‌ফ বললেন : সাতটা তেইশ মিনিটে। তার পরের ট্রেন রাত্রি বারোটার আগে আসে না।

স্টুয়ার্ট তখন বলতে লাগলেন : তাহলেই দেখুন, ফগ যদি সেই সাতটা তেইশের ট্রেনেই আসতেন, তাহলে এতক্ষণে আমরা তাকে নিশ্চয়ই এখানে দেখতে পেতুম। কাজেই বাজিটায় আমারই জিত।

ফলেস্টিন বললেন : অত ব্যস্ত হবেন না। মিস্টার ফগের রীতি-নীতি তো জানাই। আছে আপনাদের। তার মাথাটা সবসময় তেমন ঠিক থাকে না বটে, কিন্তু তিনি যে সব কাজ ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় করেন, সেটা তো আপনারা জানেন। তিনি যদি ঠিক শেষমুহূর্তেও এসে হাজির হন, আমি কিন্তু তাতে একটুও অবাক হবো না।

ফ্লানাগেন বললেন : ওঁর প্রস্তাবটাই তো একটা পাগলামো। যতই তিনি ঘড়ির কাটা ধরে কাজ করুন না কেন, পথে বেরুলেই তো হাজার ফ্যাচাং। কোনো-না-কোনো অভাবিত কারণে দু-একদিন দেরি হবেই। তাহলেই তো মিস্টার ফগের সব বন্দোবস্ত উলটে যাবে।

র‍্যাল্‌ফ বললেন : তবে আর কী! কালই বারিং-এর গদি থেকে মিস্টার ফগের টাকাগুলো তুলে-আনা যাক।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্টুয়ার্ট বললেন : আর পাঁচ মিনিট!

ফলেস্টিন বললেন : আর কেন? জয় তো আমাদেরই হলো, আসুন এখন খেলা যাক। ঐ দেখুন, পাঁচ মিনিটের দু-মিনিট গেলো।

তাঁরা খেলবার জন্যে হাতে তাশ তুলে নিলেন। কিন্তু দেয়ালের ঘড়ি থেকে চোখ কিছুতেই ফিরতে চাইলো না। তারা জানতেন যে বাজিতে তারাই জিতবেন, তবুও সময় যেন আর কাটতে চাচ্ছে না। তাশ শাফল করতে-করতে র‍্যাল্‌ফ বললেন : আর মোটে দু-মিনিট!

হঠাৎ বাইরের বিপুল লোকারণ্য থেকে সাংঘাতিক হট্টগোল শুরু হলো। চমকে উঠলেন সবাই, শুধু কাপাগলায় সুলিভান বললেন : আর একমিনিট!

এক... দুই... তিন... চার... পাঁচ... ত্রিশ সেকেণ্ড গেলো। ফিলিয়াস ফগ এলেন না। চল্লিশ গেলো, পঞ্চাশ সেকেণ্ড গেলো... তখনও এলেন না ফগ। আর মাত্র দশ সেকেণ্ড। ফ্লানাগেন গুনতে লাগলেন : এক, দুই, তিন, চার....

বাইরে হৈ-চৈ তুলকালাম হয়ে উঠলো। অত হৈ-চৈ কেন?

পাঁচ. ছয়. সাত...

ফ্লানাগেন আট বলবার আগেই হঠাৎ খুলে গেলো ক্লাব-ঘরের দরজা। উত্তেজিত জনতার আগে-আগে বিজয়গর্বে ঘরে ঢুকলেন ফিলিয়াস ফগ। সবাইকে হাসিমুখে নমস্কার জানিয়ে উদাত্তগলায় বললেন : আমি এসেছি!

তবে কি সত্যিই এলেন ফিলিয়াস ফগ? সকলে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন, সত্যিই ফিলিয়াস ফগ—সেই ভাবলেশহীন সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি।

পাঠকের বোধহয় মনে আছে, সেদিন রাত্রি আটটা পাঁচ মিনিটের সময় পাসপার্তু বিয়ের বন্দোবস্ত করবার জন্যে বিশপের কাছে গিয়েছিলো। বিশপের ওখানে গিয়ে মিনিট পনেরো তাকে বসে থাকতে হলো শুধু-শুধু, কারণ বিশপ তখন বাইরে গিয়েছিলেন।

আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় উন্মাদের মতো বিশপের বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। পাসপার্তু। দৌড়দৌড়দৌড়! প্রাণপণে সে দৌড়চ্ছিলো। তিন মিনিটের মধ্যেই সে বাড়ি এসে পৌঁছেছিলো।

রুদ্ধকণ্ঠে ফগকে সে বললে : কাল বিয়ে হতে পারে না!

কেন?

কাল রোববার!

না—সোমবার।

আজ শনিবার! আপনার ভুল হয়েছে! আমরা ঠিক সময়ের চব্বিশ ঘণ্টা আগেই এসে পৌঁছেছি। আর দশ মিনিট মাত্র সময় আছে। আপনি চলুন! আর-কোনো কথা না-বলে ফগকে টানতে-টানতে রাস্তায় নিয়ে গেলো সে, একটা ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বললে : রিফর্ম ক্লাব। জলদি! জলদি! হাজার টাকা বখশিশ!

ফগের এ-রকম ভুল কেন হয়েছিলো? দিন গুনতেই কী ভুল করেছিলেন?

এর জবাব কিন্তু খুবই সোজা। নিজের অজান্তেই ফগ অল্প-অল্প করে চব্বিশ ঘণ্টা সময় অগ্রবর্তী হয়েছিলেন। লণ্ডন থেকে যাত্রা করা অব্দি বরাবর তিনি পুবদিকে আসছিলেন কাজেই মোটের উপর একদিন বেড়েছিলো। যদি পশ্চিম থেকে চলতেন তবে তাকে একদিন পিছিয়ে পড়তে হতো। বরাবর পুবদিকে যেতে-যেতে ফগ ক্রমে দক্ষিণ মেরুর কাছে এসে পড়েছিলেন। কাজেই প্রত্যেক ডিগ্রিতে দিন চার মিনিট করে ছোটো হচ্ছিলো। সুতরাং তিনশো ষাট ডিগ্রিতে মোটের উপর চব্বিশ ঘণ্টা অগ্রবর্তী হয়েছিলেন।

আরো খোলশা করে বলতে গেলে বলতে হয়, ফগ পুবদিকে এগুতে-এগুতে আশিবার সূর্যকে দেখেছিলেন মাথার উপর, আর ঠিক সেইটুকু সময়ের মধ্যেই তার বন্ধুরা লণ্ডনে বসে সূর্যকে দেখেছিলেন ঊনআশিবার। এতেই একদিনের গণ্ডগোল হয়েছিলো।...

সেই আশ্চর্য বাজির কাহিনী তাই এবারে শেষ করতে হয়। কারণ ফিলিয়াস ফগের গলায় এখন দুলছে জয়মাল্য—ফগই বাজি জিতেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে বাজির গল্পও তো শেষ হয়ে যেতে বাধ্য। নয়-কি?